রাহমাতুললিল আলামীন

صلى الله عليه وسلم -এর

কয়েকটি ভবিষ্যৎবাণী ও তার বাস্তবতা

মাওলানা মোঃ গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী

রাহমাতুললিল আলামীন ﷺ -এর কয়েকটি ভবিষ্যৎবাণী ও তার বাস্তবতা

মাওলানা মোঃ গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী

প্রকাশকাল:
নভেম্বর ২০১৯ ইংরেজি
রবিউল আউয়াল ১৪৪১ হিজরি

হাফিজ আতিকুর রহমান

মূল্য: ১০০/= টাকা মাত্র

সূচীপত্র

ভূমিকা

الحمد لله الذي خلقني من اصلاب المسلمين وارحام المسلمات ومن علينا ببعثة سيد الانبياء وافضل الرسل والايمان بمن هو الاية الكبري لمعتبر ومن هو النعمة العظمي لمغتنم– وصلي الله علي سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مطالع أنوار التنزيل ومغارب أسرار التأويل الذين دخلوا عكاظ الحقائق بالوساطة المحمدية فما برحوا حتى ربحوا فباعوا نفوسا وشروا نفيسا وقطعوا أسباب العلائق بالهمم الحقيقية فما عرجوا حتى عرجوا فلقوا عزيزا وألقوا خسيسا فهم النجوم المشرقة بنور الهدى والرجوم المحرقة لشياطين الردى رضي الله عنهم وأرضاهم والى متبعيهم وأولا دهم– واشكره علي ما وفقني لاقتباس انوار اهل البيت لانهم اقطاب الإرشاد فى الولايات أولهم على عليه السلام ثم ابناؤه الى الحسن العسكري وآخرهم غوث الثقلين محى الدين عبد القادر الجيلاني رضى الله عنهم أجمعين لا يصل أحد من الأولين والآخرين الى درجة الولاية الا بتوسطهم – ارجوا من فضله تعالي ان يميتني علي اتباعهم ومحبتهم ويلحقني بهم في دار القرار وما ذالك علي الله بعزيز– اما بعد

বনী উমাইয়ার শাসনামলে কেবল কারবালার ঘটনাই সংঘটিত হয়নি, বরং আরো অগণিত ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আর এ সমস্ত ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ড যে তাদের দ্বারা সংঘটিত হবে সে সম্পর্কে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যতবাণী করে গেছেন।

যেমন তাঁর ভবিষ্যতবাণী- هلكة امتي علي يد اغيلمة من قريش (بخاري)

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা কুরতুবী (র.) (মৃত্যু-৬৭১ হিজরী) লেখেন-আল্লাহ অধিক জানেন, যেমনত: তাঁরা হচ্ছে ইয়াযিদ ইবনে মু'আবিয়া, উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ এবং তাদের পরবর্তী বনু উমাইয়ার শাষকগণ যারা অনেক বিদআত কর্মকাণ্ড করেছিল। তাদের দ্বারাই সংঘটিত হয়েছিল আহলে বাইত-এর হত্যাকান্ড ও তাদের বন্দী করা, মক্কা মদীনায় সর্বোত্তম মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের হত্যাকান্ড, ইত্যাদি। এ ছাড়াও হাজ্জাজ বিন ইউসুফ, সুলাইমান বিন আব্দুল মালিক ও তার ছেলের দ্বারা হেজাজ, ইরাক ও অন্যান্য স্থানে যে সকল রক্তপাতের ঘটনা, ধন-সম্পদ বিনষ্ট ও জনগণকে হত্যার যে ঘটনাবলি সংঘটিত হয়েছিল তাও রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ ভবিষ্যতবাণীর ফসল। (আত-তাযকেরাহ, পৃষ্ঠা: ৫০১-৫০২)

ফাযাইলে ইয়াযিদের লেখক ৫০০ হিজরীর আব্দুল মুগীস হাম্বলীর অনুসরণে যারা বনু উমাইয়ার অপকর্মকে বৈধ করার উদ্দেশ্যে লেখালেখি ও বক্তৃতা বিবৃতি দিচ্ছেন তাদের মুখোশ উন্মোচনের উদ্দেশ্যে আমাদের এ লেখা।

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন আমার উম্মত পনেরটি কাজ করবে তখন তাদের উপর বালা মুসীবত অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যক হয়ে যাবে। আমরা দেখি এ কাজসমূহের প্রায় প্রতিটি কাজই উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে সংঘটিত হতে শুরু হয়। আমরা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ ভবিষ্যতবাণীর সাথে উমাইয়া শাষকদের আচরণের যে মিল রয়েছে এটাই আলোচ্য বইয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

এ প্রসঙ্গে তিরমিযি শরীফের দু'টি হাদীস নিম্নে উল্লেখ করলাম।

عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعلت امتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء فقيل وما هن يا رسول الله قال إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفا أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرذلهم واكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا ومسخا

অনুবাদ: হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন আমার উম্মত পনেরটি কাজ করবে তখন তাদের উপর বালা মুসীবত অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যক হয়ে যাবে। বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, কাজগুলো কি? তিনি বললেন, যখন গনীমতকে মূল সম্পদ মনে করা হবে, আমানতকে গনীমত মনে করা হবে, যাকাতকে জরিমানা মনে করা হবে, পুরুষ স্ত্রীর আনুগত্য করবে, মায়ের অবাধ্য হবে, বন্ধুদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে কিন্তু পিতার সাথে দুর্ব্যবহার করবে, মসজিদে শোরগোল বেশী হবে, নিকৃষ্ট লোকেরা জাতির শাষক হবে, লোকজন তার অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য তাকে সম্মান দেখাবে, মদ পান করা হবে, রেশমি পোষাক পরিধান করবে, গায়িকা ও নৃত্যকার মহিলাকে নাচ-গানের জন্য ব্যবহার করা হবে, উম্মতের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদেরকে লা'নত করবে। এরূপ যখন সংঘটিত হবে তখন যেন তারা লাল-অন্ধকার বাতাস, ভূমিধস ও আকৃতি বিকৃতির অপেক্ষা করে। (তিরমিযি)

দ্বিতীয় হাদীসটিও অনুরোপ মর্মের। কেবল দু' একটি শব্দের ভিন্নতা রয়েছে। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-

عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع

অনুবাদঃ রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তখন বায়তুল মালের সম্পত্তিকে নিজস্ব সম্পদ মনে করা হবে, আমানতকে গনীমত মনে করা হবে, যাকাতকে জরিমানা মনে করা হবে, ধর্মীয় উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করা হবে, পুরুষ স্ত্রীর আনুগত্য করবে, মায়ের অবাধ্য হবে, বন্ধুদরে সাথে ভালো ব্যবহার করবে কিন্তু পিতার সাথে দুর্ব্যবহার করবে, মসজিদে উচ্চ স্বরে আওয়াজ হবে, ফাসিক লোকেরা কওমের নেতা হবে, নিকৃষ্ট লোকেরা জাতির শাষক হবে, লোকজন তার অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য তাকে সম্মান দেখাবে, গায়িকা-নৃত্যকার মহিলাদেরকে প্রকাশ্যে ব্যবহার করা হবে, মদ পান করা হবে, উম্মতের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদেরকে লা'নত করবে। এরূপ যখন সংঘটিত হবে তখন যেন তারা লাল রংয়ের বাতাস, ভূমিকম্প, ভূমিধস, আকৃতি বিকৃতি ও আসমান থেকে পাথর নিক্ষেপের অপেক্ষা করে। (তিরমিযি)

'মাজমাউয যাওয়াইদ' কিতাবে হযরত আউফ (রা.) হতে বর্ণিত অনুরোপ একটি হাদীস রয়েছে। সেখানে আরো অতিরিক্ত উল্লেখ আছে-

وقعدت الحملان على المنابر واتخذ القرآن مزامير

অর্থাৎ অল্প বয়স্ক লোকেরা মিম্বরে ভাষন দিতে শুরু করবে, কুরআনকে সংগীতের ন্যায় তিলাওয়াত করবে। (মাজমাউয যাওয়াইদ)

আমরা উমাইয়া শাষনামলের শুরুর দিকের কয়েকজন শাষকের কিছু কর্মকাণ্ড নির্ভরযোগ্য ও বিশ্ববিখ্যাত হাদীস ব্যাখ্যাকার ও সীরতগ্রন্থকারদের কিতাব থেকে উপস্থাপন করেছি, যাতে পাঠক কিছুটা হলেও বুঝতে পারেন যে, এসব শাষকরা কি পরিমান যালিম ও ক্ষমতা লিপ্সু ছিলেন। ক্ষমতা পাকাপোক্ত করতে গিয়ে তারা যাকেই তাদের অন্তরায় মনে করেছেন তাকেই নির্যাতনের মাধ্যমে মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন, নতুবা হত্যা করে সরিয়ে দিয়েছেন। এতে তিনি সাহাবীই হোন কিংবা তাবিঈ।

উল্লেখ্য যে, উমাইয়া শাষকদের আলোচনা করতে গিয়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গে এখানে হযরত মুআবিয়া (রা.) এর নামও এসেছে। তাঁর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও পদক্ষেপের

আলোচনা এসেছে। তবে তিনি যেহেতু আল্লাহর রাসূলের সাহাবী ছিলেন, আর সকল সাহাবী সম্পর্কে আল্লাহ পাক ঘোষনা করেন, وَكُلًّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى অর্থাৎ তাঁদের সকলকেই আল্লাহ পাক জান্নাতের ওয়াদা করেছেন। একারণে তাঁর সম্পর্কে আমাদের মন্তব্য হচ্ছে এটাই, যা হযরত আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) তাঁর ফতওয়ায়ে আযিযী কিতাবে উল্লেখ করেছেন। আমরা তাঁর মন্তব্যটি বিস্তারিত আমাদের কিতাবের 'হযরত মু'আবিয়া (রা.) ও হযরত ওয়ায়েল ইব্ন হুজুর (রা.) এর ঘটনা' অধ্যায়ে উল্লেখও করেছি।

পুস্তিকাটি লেখার কারণ

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের প্রায় সকল অনুসারীই কোন না কোন ভাবে তরীকার সাথে সম্পৃক্ত। আর তরীকার সিলসিলাহর উর্ধতন শায়খ হচ্ছেন হযরত আলী (রা.)। তাঁর সাথে রয়েছেন হযরত ফাতিমা (রা.), হযরত হাসান (রা.) ও হযরত হুসাইন (রা.)। আর তরীকতের শায়খগণের সাথে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ না থাকলে তরীকতের ফয়েয লাভ করা যায় না। আহলে বাইতের সাথে বনু উমাইয়ার দুর্ব্যবহার সম্পর্কে আমরা অবগত না হয়ে যদি তাদের উপর শ্রদ্ধাবোধ হারিয়ে ফেলি, তা হলে তরীকতের সম্পর্ক রক্ষা হবে না।

এ প্রসঙ্গে সাইয়িদ মুফতি আমিমুল ইহসান (র.) 'তারীখে ইসলাম' কিতাবে লেখেছেন-

তাসাউফের ক্ষেত্রে তাঁর [হযরত আলী (রা.)] এর অবস্থান অনেক উপরে। আত্মশুদ্ধির অন্তর্নিহিত ব্যাপারসমূহে তাঁর ব্যক্তিত্ব অনন্য। তাসাউফের অধিকাংশ সিলসিলাহ্ আলী মুরতাদা (রা.)-এর সিনার নূর থেকে মুনাওয়ার হয়েছে।

তাসাউফপন্থীদের সরদার হযরত জুনাইদ বাগদাদী (র.) বলেন, উসূল এবং আত্মত্যাগের ক্ষেত্রে আমাদের শাইখুশ শুয়ুখ হচ্ছেন হযরত আলী (রা.)। (তারীখে ইসলাম, পৃষ্ঠাঃ ১২৩)

ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র.) বলেন-

ফয়যে এলাহী অর্জন করার মাধ্যম সম্পর্কে মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র.) কে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তরে বলেন, এটা অর্জনের দু'টি উপায় রয়েছে। একটি হল কোন মাধ্যম ছাড়া; আর অপরটি শায়খের মাধ্যমে। দ্বিতীয় পদ্বতি সম্পর্কে তিনি লিখেন- সকল কুতুব, আওতাদ ও আবদাল এবং সাধারন ওলী আউলিয়া এ দ্বিতীয় রাস্তার সাথে সম্পর্কিত। তরীকতের পথ বলতে এটাকেই বুঝায়। প্রচলিত জযবা এরই অন্তর্ভুক্ত। এ রাস্তার জন্য মাধ্যমের প্রয়োজন। এ রাস্তার পথিকদের প্রধান এবং এ বুযুর্গগণের ফয়েয লাভের অগ্রদূত হচ্ছেন হযরত আলী (রা.) এবং

তিনিই হচ্ছেন এ মহান মর্তবার অধিকারী। যেমন এ মাকামে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কদম মুবারক হচ্ছে তাঁর মাথার উপর। আর হযরত ফাতিমা (রা.) ও হাসানাইন (রা.) এ মাকামে তাঁদের সাথে শরীক। (মকতুবাত শরীফ, ৩য় খণ্ড, মকতুব নং ১২৩)

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) তাফসীরে মাযহারীতে كَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ আয়াতের তাফসীরে লেখেন-

ورواه الترمذي بلفظ انى تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الاخر كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الأرض وعترتى اهل بيتي ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما- وروى الترمذي عن جابر قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجه يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب فيقول يا ايها الناس انى تركت فيكم ما ان أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتى اهل بيتي- قلت أشار النبي صلى الله عليه وسلم الى اهل البيت لانهم اقطاب الإرشاد فى الولايات أولهم على عليه السلام ثم ابناؤه الى الحسن العسكري وآخرهم غوث الثقلين محى الدين عبد القادر الجيلي رضى الله عنهم أجمعين لا يصل أحد من الأولين والآخرين الى درجة الولاية الا بتوسطهم كذا قال المجدد رضى الله عنه

অনুবাদঃ তিরমিযী শরীফের বর্ণনায় এ শব্দ রয়েছে যে, 'আমি তোমাদের কাছে এমন একটি বস্তু রেখে যাচ্ছি যা তেমার আঁকড়ে ধরলে আমার পরে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। এর একটি অপরটির চেয়ে উত্তম মর্যাদাশীল। একটি হচ্ছে আল্লাহর কিতাব, যা আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত একটি দীর্ঘ রশি। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে আমার আহলে বাইত। হাউযের উপর অবতরনের সময় পর্যন্ত একটি অপরটি হতে আলাদা হবে না। সুতরাং দেখা উচিত তোমরা এতদোভয়ের ক্ষেত্রে কোন ধরনের প্রতিনিধিত্ব কর।

তিরমিযী শরীফের এক বর্ণনায় আছে, হযরত জাবির (রা.) বলেন, আমি হজ্জের সময় আরাফার দিন রাসূল রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বীয় উটনি 'কাসওয়া'র উপর আরোহন করে ভাষন দিতে দেখেছি, তিনি ইরশাদ করেন, হে মানুষেরা! 'আমি তোমাদের কাছে এমন একটি বস্তু রেখে যাচ্ছি যা তেমার আঁকড়ে ধরলে আমার পরে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। এর একটি হচ্ছে আল্লাহর কিতাব, আর অপরটি হচ্ছে আমার আহলে বাইত।

আমি (সানাউল্লাহ পানিপথী) বলি, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহলে বাইতকে আঁকড়ে ধরার জন্য এ কারণে নির্দেশ দিয়েছেন কারণ আহলে বাইতই হচ্ছেন বেলায়তের সিলসিলাহর পথ পদর্শক। আগে পরের কারো জন্যই তাঁদের ওয়াসীলাহ ছাড়া বেলায়তের স্তরে পৌছা সম্ভব নয়। এ স্তরের প্রথমে হচ্ছেন হযরত আলী (রা.), এর পর তাঁর সাহেবজাদাগণ। এমনিভাবে হযরত হাসান আসকারী (র.) পর্যন্ত এবং এ স্তরের শেষে রয়েছেন গাওসে সাকালাইন মুহিউদ্দীন আব্দুল কাদির জিলানী (র.)। মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র.) এভাবেই বর্ণনা করেছেন। (তাফসীরে মাযহারী)

তরীকতের শায়খগণের সাথে সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত এ প্রসঙ্গে শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর বক্তব্যঃ

আহলে বাইতগণ যেহেতু তরীকতপন্থীদের শায়খুশ শুয়ুখ, তাই তাদের সাথে কি ধরনের সম্পর্ক রাখতে হবে এ প্রসঙ্গে শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রা.) এর একটি বক্তব্য তুলে ধরছি।

قالوا وركن الاعظم ربط القلب بالشيخ على وصف المحبة- والتعظيم وملاحظة صورته- (القول الجميل)

অর্থাৎ (চিশতিয়া তরীকার মাশায়িখগণ) বলেন, তরীকতের প্রধান রুকন হচ্ছে মুহব্বত ও তা'যীমের সাথে শায়খের সাথে অন্তরের সম্পর্ক রাখা এবং তাঁর আকৃতির কল্পনা করা। (আল-কাউলুল জামিল)

খিলাফতে রাশিদাহ

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, সে সকল ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হওয়ার পর ইহাকে দালাইলুল নবুওয়াত বলা হয়। খুলাফায়ে রাশিদীন সর্ম্পকে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ মুফতি আমিমুল ইহসান (রঃ) এর 'তারিখে ইসলাম' কিতাব থেকে কিছু আলোচনা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

খিলাফতে রাশিদার ঐতিহাসিক পর্যালোচনা, তাঁদের পথ পদ্ধতি নির্বাচন, তাঁদের আমলী জীবন এবং তাদের কার্যাবলি দেখে নিঃসন্দেহে এটা বলা যায় যে, সহীহ খিলাফত তথা খিলাফতে রাশিদাহ বা নবুওতের পদ্ধতি অনুযায়ী খিলাফত পরিচালনা চার খলিফার পরই শেষ হয়ে যায়। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী, 'আমার পর ত্রিশ বছর খিলাফত থাকবে' (নাসায়ী, আবূ দাউদ, তিরমীযি ও ইবনে মাজাহ) হাদীসের মর্ম অনুযায়ী চার খলীফার খিলাফত প্রায় ত্রিশ বছর হয়ে যায়। ৪১ হিজরীর ৯ রবিউল আউয়াল তারিখে খিলাফত বনু উমাইয়ার হাতে এসে রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়। উমাইয়াদের আতংক ও

দাপটে আরব উপদ্বীপ তথা সমগ্র মুসলিম জাহান কেঁপে ওঠে। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঠিকই বলেছেন- 'তোমাদের মধ্যে নবুওত ততদিন অবশিষ্ট থাকবে, যতদিন আল্লাহ চাইবেন। এর পর তা উঠিয়ে নেবেন। এর পর নবুওতের পথ-পদ্ধতির উপর খেলাফত থাকবে, যতদিন আল্লাহ চাইবেন। এর পর চিবিয়ে খাওয়াদের রাজতন্ত্র শুরু হবে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, তারিখে ইসলাম, পৃষ্ঠা: ১৩১-১৩২)

উল্লেখ্য: আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী (রা.) শাহাদত বরণ করেছিলেন ৪০ হিজরীতে আর খেলাফতের ৩০ বছর পূর্ণ হওয়ার বাকি ছিল ৬ মাস। এ জন্য হযরত হাসান বিন আলী (রা.) এর ৬ মাস খিলাফতে রাশিদার অর্ন্তর্ভূক্ত ছিল।

এ প্রসঙ্গে হাফিয ইমাদ উদ্দিন ইবনে কাসীর এর 'আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া কিতাব থেকে কিছু আলোচনা তুলে ধরা হলো।

হযরত হাসান (রা.) ছিলেন একাধারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দৌহিত্র, মুসলমানদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, গভীর জ্ঞান সমৃদ্ধ সাহাবী, আলিমদের একজন, ধৈর্যশীল ও প্রসিদ্ধ অভিজ্ঞ সাহাবী। তিনি ছিলেন খুলাফায় রাশিদীনের পঞ্চম খলীফা। এর প্রমান রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আযাদকৃত দাস হযরত সফীনা (রা.) থেকে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস যা 'দালাইলুন নুবুওয়াত' গ্রন্থে আছে। রাসলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- –الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا।

অনুবাদ: আমার পরে খিলাফত নীতি বহাল থাকবে ৩০ বছর পর্যন্ত। তারপর শুরু হবে রাজতন্ত্র।

হযরত হাসান (রা.) এ শাসনামল যোগ করলে খিলাফতকাল মোট ৩০ বছর পূর্ণ হয়। কারণ ৪১ হিজরীর রাবিউ আউয়াল মাসে তিনি মু'আবিয়া (রা.) এর সপক্ষে নিজে খিলাফত থেকে সরে দাঁড়ান, তাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওফাত থেকে এ সময় পর্যন্ত ৩০ বছর পূর্ণ হয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওফাত হয় ১১ হিজরী সনের রাবউল আউয়াল মাসে। এ হাদীস এবং এর বাস্তবতা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সত্য নবী হওয়ার একটি উজ্জ্বল প্রমাণ। হযরত হাসান (রা.) এর এই আপোষরফাকে বহু আগেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রশংসা করে গিয়েছেন। এভাবে হযরত হাসান (রা.) ধ্বংসশীল এ দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করেছেন, চিরস্থায়ী আখিরাতের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছেন এবং এই উম্মাতের রক্তপাত বন্ধের পথ অবলম্বন করেছেন। তিনি খিলাফতের পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন এবং মু'আবিয়া (রা.)'র হাতে রাজত্ব সোর্পদ করেছেন। ফলে সকল মুসলমান একজন শাসকের পেছনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। (আল-বিদায়া ওয়াল নিহায়া, খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ৪১-৪২)।

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া কিতাবে মু'আবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা.) ও তাঁর রাজত্ব নামক শিরোনামের অধীনে লিখেছেন-

ইতিপূর্বে আমরা হাদীস উল্লেখ করেছি যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পর খিলাফত ভিত্তিক শাসন চলবে ৩০ বছর। তারপর শুরু হবে রজতন্ত্র। হযরত হাসান (রা.) এর খিলাফতকাল অবসানের সাথে সাথে ৩০ বছরের খিলাফত ভিত্তিক শাসন পূর্ণ হয়। সুতরাং মু'আবিয়া (রা.) প্রথম রাজা বা বাদশাহ। তাঁর যুগ প্রথম রাজত্বের যুগ। তিনি ছিলেন রাজাদের মধ্যে উত্তম রাজা। আল্লামা তাবরানী হযরত আলী ইবনে আবদুল আযীয, হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) ও আবূ উবয়দা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তাঁরা বলেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

ان هذا الامر بدا رحمة ونبوة ثم يكون رحمة وخلافة ثم كائن ملكا عضوضا ثم كائن عتوا
وجبرية وفسادا في الارض يستحلون الجرير والفروج والخمور ويرزقون علي ذالك
وينصرون حتي يلقوا الله عز وجل–

অনুবাদ: দেশ শাসনের এই বিষয়টি শুরু হয়েছে রহমত ও নবূওতের ভিত্তিতে। এরপর এটি পরিণত হবে রহমত ও খিলাফত রীতিতে। এর পর এটি পরিণত হবে জুলুমবাজ রাজতন্ত্রে। এরপর এটি পরিণত হবে স্বৈরাচারী, সীমালঙ্ঘন, বল প্রয়োগ ও পৃথিবীতে বিপর্যয় ও বিশৃংখলা সৃষ্টির মাধ্যম রূপে। তখন তারা রেশমী কাপড় পরিধান, ব্যভিচার ও মদপান বৈধ করে নিবে। তবুও তারা রিযিকপ্রাপ্ত হবে এবং সাহায্য পাবে। মৃত্যুর মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত ঘটার পূর্ব পর্যন্ত এভাবে চলতে থাকবে। এই হাদীসের সনদ উত্তম।

"দালাইলুল নুবুওয়াত" অধ্যায়ে আমরা একটি হাদীস উল্লেখ করেছি যা ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনে মুহাজির সূত্রে আবদুল মালিক ইবনে উমর থেকে বর্ণিত হয়েছে। আবদুল মালিক ইবন উমর বলেন, হযরত মু'আবিয়া (রা.) বলেছেন, আমাকে দেশ শাসনের দায়িত্ব গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একটি হাদীস। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন– يا معاوية ان ملكت فاحسن অর্থাৎ হে মু'আবিয়া! তুমি যদি রাজা হও তবে ভালভাবে রাজকার্য পরিচালনা করবে।

ইমাম বায়হাকী (রা.) হাদীসটি ইসমাঈল সূত্রে উল্লেখ করেছেন। এরপর বায়হাকী (রা.) বলেন, অন্যান্য সূত্রে এই হাদীসের সমর্থনে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তার একটি হল-আমর ইবনে ইয়াহইয়া এর হাদীস। তিনি তাঁর দাদা সাঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদিন মু'আবিয়া (রা.) পানির পাত্র হাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পেছন পেছন যাচ্ছিলেন। এক

পর্যায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দিকে ফিরে তাকলেন এবং বললেন- يا معاوية ان وليت امرا فاتق الله واعدل- অর্থাৎ হে মু'আবিয়া! তুমি যদি দেশ শাসনের দায়িত্ব পাও তবে আল্লাহকে ভয় করবে এবং ন্যায় পরায়ণতা অবলম্বন করবে।

মু'আবিয়া (রা.) বলেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে সর্বদা আমার মনে হয়েছে যে, আমি ওই দায়িত্বপ্রাপ্ত হব এবং আমাকে ওই ঝামেলা পোহাতে হবে। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ৪৮)

খিলাফতে বনু উমাইয়া

সাইয়িদ মুফতি মাওলানা আমীমুল ইহসান আল মুজাদ্দিদী আল বারাকাতী (র.) এর 'তারীখে ইসলাম' কিতাব- যে কিতাবটি দীর্ঘ দিন পর্যন্ত বাংলাদেশের মাদরাসা সমূহের সিলেবাস ভুক্ত ছিল- সে কিতাবে তিনি বনু উমাইয়া সম্পর্কে যে বক্তব্য লিখেছেন তা নিম্নে উল্লেখ করছি।

সাইয়িদুল কাওনাইন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পঞ্চম পূর্ব পুরুষের নাম ছিল আবদে মনাফ। আবদে মনাফের ছয় সন্তান ছিলেন। তন্মধ্যে হাশিম, মুত্তালিব ও আবদে শামস তিন জন সহোদর ভাই ছিলেন। হাশিম এর সন্তানকে হাশিমী এবং মুত্তালিবের সন্তানকে মুত্তালিবী বলা হয়ে থাকে। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন হাশিমী। মুত্তালিবী ও হাশিমীরা জাহিলিয়তের যুগে ও ইসলামের যুগে একত্রে ছিলেন। আবদে শামসের সন্তানদেরকে শামসি বলা হয়ে থাকে। আবদে শামসের এক সন্তান ছিলেন উমাইয়া। তার বংশধরকেই উমবী বা বনু উমাইয়া বলা হয়।

হাশিম তাঁর দানশীলতা ও জ্ঞান-বুদ্ধির কারণে কুরাইশদের সরদার হিসেবে পরিগণিত হয়েছিলেন। কিন্তু তার ভাতিজা উমাইয়া তাঁর নেতৃত্ব মেনে নেননি। এতে তাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। যাই হোক, পরবর্তীতে হাশিমী ও উমবীদের মধ্যে জাহিলিয়তের যুগে শক্তি প্রদর্শনের জন্য যুদ্ধ চলতে থাকে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে কিছু পবিত্র-আত্মা লোক ছাড়া বনু উমাইয়ার বাকী সকল লোক ইসলাম ও ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরোধীতায় সর্বসাধ্য চেষ্টা করে। বদরের যুদ্ধের পর থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত মক্কাবাসীদের সাথে যত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল সব ক'টিতেই উমাইয়া বংশোদ্ভূত আবু সুফিয়ান নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কারণ ইসলামের উন্নতিকে তিনি হাশিমীদের কর্তৃত্ব বেড়ে যাওয়া মনে করতেন। মক্কা বিজয়ের পর রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কারণে এ বংশগত বিরোধ চলে যায়। কিন্তু হযরত

উসমান (রা.) এর শাহাদতের পর হযরত আলী হাশিমী (রা.) এর খিলাফতকাল থেকে আবার পুরোনো বিরোধ ফিরে আসে। সাইয়িদুনা হযরত আলী (রা.) এর খিলাফত শেষ হলে ৪১ হিজরীতে উমাইয়া শাসনের গোড়া পত্তন হয়। এ শত্রুতাই আবার ১৩২ হিজরীতে আব্বাসী হাশিমী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কারণ হয়। ইসলামের ইতিহাসে উমাইয়া বংশের তিন জন লোক গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন (১) তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা.), (২) মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রা.) বিন হরব বিন উমাইয়া যিনি ছিলেন উমাইয়া শাসনের প্রতিষ্ঠাতা, যদিও মুআবিয়ার বংশধরদের রাজ্য শাসন অধস্তন তৃতীয় পুরুষে শেষ হয়ে যায়। (৩) মারওয়ান বিন হকম বিন আবুল আস বিন উমাইয়া। হযরত মু'আবিয়া (রা.) এর পরিবারের শাসন সমাপ্তির পর মারওয়ানের পরিবারের শাসন শুরু হয়। ১৩২ হিজরী পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম জাহানে এ বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকে। এর পর আন্দালুসিয়ায় কয়েক শতাব্দি পর্যন্ত তাদের রাজত্ব অবশিষ্ট থাকে। (তারীখে ইসলাম, পৃষ্ঠা: ১৩৭)

হযরত আলী (রা.) এর ফযিলত ও একটি পর্যালোচনা

হযরত আলী (রা.) খুলাফায়ে রাশিদীনের চার জনের মধ্যে একজন। তাঁর ফযিলত সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) 'ইযালাতুল খাফা' কিতাবে এর কারণ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম হাকীম আহমদ বিন হাম্বল (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবাগণের মধ্যে হযরত আলী (রা.) এর ফযিলতের হাদীস বেশি বর্ণিত হয়েছে। এত হাদীস আর কারো সম্পর্কে বর্ণিত হয়নি। আমি (ওয়ালি উল্লাহ) বলি, আলী (রা.) এর ফযিলতের দু'টি কারণ রয়েছে। (১) তিনি প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহনকারীদের মধ্যে ছিলেন। যার কিছু আলোচনা উক্ত কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত: তিনি রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকটতম আত্মীয় এবং আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষা করার বিষয়ে অগ্রগামী। কারণ তিনি এ বিষয়ে বেশি জ্ঞান রাখেন। আল্লাহ তা'আলার মেহেরবনী, তিনি আলী (রা.) এর লালন পালনের দায়িত্ব তার নবীর হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন, যার কারণে তার মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অত:পর রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ফাতিমা (রা.) কে তাঁর কাছে বিয়ে দিলেন। তখন তার মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পেল। (ইযালাতুল খাফা, খণ্ড" ৪, পৃষ্ঠা: ৪৪১)

নিম্নে হযরত আলী (রা.) এর ফযিলতের কয়েকটি হাদীস পেশ করা হলো:

(১) হযরত সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,একদা রাসূলুল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী (রা.) কে লক্ষ করে বলেন, হযরত মূসা (আ.) -এর নিকট হযরত হারুন (আ.)-এর যে মর্যাদা ছিল, তুমি ও আমার নিকট সে পর্যায়ে রয়েছ। তবে পার্থক্য এটাই যে, আমার পরে আর কোন নবী নেই। (বুখারী)

নোটঃ হযরত শাহ আলী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) উক্ত হাদীসেকে মুতাওয়াতির পর্যায়ের লিখেছেন। আর মুতাওয়াতির ঐ হাদীসকে বলে, যার প্রতিটি স্তরে এত অধিক সংখ্যক বর্ণনাকারী রয়েছেন, যাদের সংখ্যা গণনা করা যায় না এবং তাদের সংখ্যাধিক্য, ন্যায়পরায়নতা ও বাসস্থানের ভিন্নতার কারণে তাদের মিথ্যার উপর ঐক্যমত হওয়ার ধারণা করা যায় না। (মিজানুল আখবার)

(২) হযরত যিরব ইবনে হোবাইশ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা হযরত আলী (রা.) বলেন, সে মহান আল্লাহ পাকের কসম! যিনি বীজ ফুটিয়ে অঙ্কুর বের করেন এবং বীর্য হতে প্রাণী সৃষ্টি করেন, নবীয়ে উম্মী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে এ অসিয়ত করেছেন যে, কেবল মুমিনই আমাকে মহব্বত করবে এবং মুনাফিক আমার প্রতি হিংসা পোষণ করবে। (মুসলিম শরীফ)

(৩) হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) বলেন, নবী করীম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আলী আমার হতে আর আমি আলী হতে। আর সে প্রত্যেক মুমিনের বন্ধু । (তিরমিযী)

(৪) হযরত যায়েদ ইবনে আকরাম (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি যার বন্ধু , আলীও তার বন্ধু । (আহমদ ও তিরমিযী)

নোটঃ উক্ত হাদীস প্রসঙ্গে হাফিয আবুল ফারয ইবনে জওযী (মৃত্যু ৩৯৭) 'সিফতুস সফওয়াহ' কিতাবে লিখেছেন যে উক্ত হাদীসটি ৩০ জন সাহাবী বর্ণনা করেছেন।

(৫) হযরত হুবশী ইবনে জুনাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আলী আমার হতে, আর আমি আলী হতে। আর আমার পক্ষ হতে কেউ দায়িত্ব পালন করতে পারবে না, আমি অথবা আলী ব্যতীত। (তিরমিযী, ইমাম আহমদ (র:) হাদীসটি জুনাদাহ হতে বর্ণনা করেছেন।

(৬) হযরত বারা ইবনে আযিব ও যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) হতে বর্ণিত, একদা রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খোম নামক স্থানে

ঝিলের কাছে অবতরণ করলেন, (খোম মক্কা-মদিনার মধ্যবর্তী একটি স্থানের নাম) তখন তিনি হযরত আলী (রা.) এর হাত ধরে বললেন, এটা কি তোমরা জান না, আমি মুমিনদের নিকট তাদের প্রাণ অপেক্ষা অধিক প্রিয়? লোকেরা বললেন, হাঁ। তিনি আবার বললেন, তোমরা কি জান না, আমি প্রত্যেক মুমিনদের কাছে তার প্রাণ অপেক্ষা অধিক প্রিয়? তারা বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, ইয়া আল্লাহ! আমি যার বন্ধু আলীও তার বন্ধু। (তারপর তিনি এ দু'আ করলেন) হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি আলীকে ভালোবাসবে তুমিও তাকে ভালোবাস। আর যে ব্যক্তি তাকে শত্রু ভাবে, তুমিও তার সাথে শত্রুতা পোষণ কর। (বর্ণনাকারী বলেন) এরপর যখন হযরত আলী (রা.) এর সাথে হযরত উমর (রা.) এর সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি তাঁকে বললেন, ধন্যবাদ হে আবু তালিবের পুত্র! তুমি সকাল-সন্ধ্যা (অর্থাৎ সব সময়) প্রতিটি ঈমানদার নারী-পুরুষের বন্ধু হয়েছ। (আহমদ)

নোটঃ উক্ত হাদীস সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীরা যে সকল অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তার জবাব দিয়েছেন মোল্লা আলী কারী তার মিরকাত কিতাবে।

(৭) হযরত উম্মে সালমা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোনো মুনাফিক আলীকে মহব্বত করে না এবং কোনো মুমিন আলীর প্রতি হিংসা রাখে না। (আহমদ ও তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী (র:) বলেছেন, হাদীসটি হাসান এবং সনদের দিক দিয়ে গরীব)।

নোটঃ বুখারী শরীফের প্রথম এবং শেষ হাদীস হলো গরীব পর্যায়ের। যে সকল ধোঁকাবাজ হাদীসদ্বয়কে গরীব বলে প্রত্যাখান করতে চান তাদের চিন্তা করা উচিত।

(৮) হযরত উম্মে সালমা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আলীকে গালি দিল, সে যেন আমাকেই গালি দিল। (আহমদ)

আলী (রা.) এর ফযিলতের আরো কয়েকটি হাদীস

আহলে বাইত বিদ্বেষী অনেক তাইমিয়ি আলিম আহলে বাইতের ফযিলতের কোন হাদীস শুনলে বিচার বিশ্লেষণ ছাড়াই বলে থাকেন এটা মওদু বা শিয়াদের বানানো হাদীস। শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) এর 'ইযালাতুল খাফা' কিতাবে আলী (রা.) এর ফযিলতের ব্যাপারে অনেক মুতাওয়াতির পর্যায়ের হাদীস বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও আরো অনেক হাদীস বর্ণনা করেছে, এ হাদীসগুলো সর্ম্পকে তিনি বলেন-

بالجملہ ماز ایراد احادیث موضوعہ واحادیث شدیدۃ الضعف کہ بکار متابعت وشواهد نمی اید تحاشی داریم وانسہ در مرتبہ صحت وحسن است باضعف متحمل دارد ان را روایت کنیم-

মোট কথা: মাওযু হাদীস ও এধরনের যয়ীফ হাদীস যা তার চরম দুর্বলতার কারণে আদৌ দলিল হিসাবে সহায়ক নয়, তা এ গ্রন্থে সংকলিত করা থেকে বিরত রয়েছি। শুধু যে সব হাদীস সহীহ ও হাসান পর্যায়ের কিংবা সহনীয় পর্যায়ের সেগুলো বর্ণনা করব। (ইযালাতুল খাফা, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৪৪৩)

উল্লেখ্য, উপরোল্লিখিত মূলনীতির আলোকে হযরত আলী (রা.) এর ফযিলত সম্পর্কে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র:) যে হাদীসগুলো 'ইযালাতুল খাফা' কিতাবে উল্লেখ করেছেন তা থেকে কয়েকটি হাদীস নিম্নে পেশ করা হলো।

রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার জন্মদাত্রী মায়ের পর ফাতিমা বিনতে আসাদই আমার মা ছিলেন। আবু তালিব কিছু ব্যবসা-বানিজ্য করতেন। ফলে তার এখানে দাওয়াতী মেহমান থাকত। আমরা সবাই একসঙ্গে বসে খেতাম। তার স্ত্রীর এ স্বভাব ছিল যে, মেহমানদের খানা থেকে তিনি কিছু রেখে দিতেন যাতে আমি পরে তা খেতে পারি। এ বর্ণনাটি হাকিমের। (ইযালা)

হায়্যাতুল উরফী থেকে ইমাম আহমদ (র.) বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি একবার হযরত আলী (রা.)কে মিম্বারে বসে এত বেশী হাসতে দেখলাম, যা আর কখনো দেখিনি। এমনকি তাঁর দাঁতের মাড়ি পর্যন্ত দেখা গেল। অত:পর তিনি বললেন, পিতা আবু তালিবের কথা আমার মনে পড়ল। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে বতনে নাখলায় নামায পড়ছিলাম। হঠাৎ আবু তালিব এসে তা দেখে বললেন, ভাতিজা! তোমরা দু'জন এ কি করছ? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তিনি বললেন, তোমরা যা করছ আর তোমরা যা বলছ, তাতে ক্ষতির কিছু নেই। কিন্তু আল্লাহর কসম! আমার পশ্চাদদেশ কখনো উঁচু করতে পারব না। পিতার এ কথা বলে তিনি হাসতে লাগলেন। তারপর বললেন হে আল্লাহ! আমার জানা নেই যে, তোমার নবী ছাড়া আমার আগে এ উম্মতের কেউ তোমার ইবাদত করেছে। এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন, লোকেরা নামায পড়া শুরু করার আগেই আমি নামায পড়েছি। (ইযালাতুল খাফা)

উবাইদুল্লাহ ইবনে আবী মুলায়কা থেকে তার পুত্র আবু বকর বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, সিরিয়া থেকে একজন লোক এসে ইবনে আব্বাস (রা)'র কাছে হযরত আলী (র.)'র বদনাম করছিল । হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তাকে একটি কংকর নিক্ষেপ করে বললেন, হে আল্লাহর দুশমন! তুই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দিলি? অথচ আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন-

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا

অর্থাৎ যে সব লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদের দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত করবেন এবং তাদের জন্যে প্রস্তুত রয়েছে অবমাননাকর আযাব। (সুরা আহযাব: আয়াত ৫৭) [ইযালা]

হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছি যে, আমি ইলমের শহর আর আলী তার দরজা। সুতরাং কেউ যদি ইলম হাসিল করতে চায়, সে যেন দরজায় উপস্থিত হয়। [ইযালা] তিরমিযি শরীফে অনুরোপ মর্মের হাদীস রয়েছে। ইবনে হজর আসকালানী (র.) উক্ত হাদীসকে হাসান বলেছেন। (মিরকাত, খণ্ড: ১১, পৃষ্ঠা: ২৫৩)

হযরত আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা মুনাফিকদের চিনতাম আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি অনাস্থা, নামায থেকে পিছিয়ে থাকা ও হযরত আলী (র.)'র সাথে শত্রুতা পোষণ থেকে। [ইযালা]

হযরত সালমান (রা.) থেকে বর্ণিত, তাকে এক লোক জিজ্ঞেস করল, আপনি হযরত আলীকে এত ভালবাসেন কেন? তিনি বললেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আলীকে ভালবাসল, সে আমাকেই ভালবাসল আর যে ব্যক্তি আলীকে ঘৃণা করল, সে আমাকেই ঘৃণা করল। [ইযালা]

হযরত সা'দ ইবনে যুরারাহ থেকে আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আলীর ব্যাপারে আমার কাছে তিন বিষয়ে ওহী এসেছে। (১) তাঁকে মু'মিনদের সরদার বলা হয়েছে। (২) তাঁকে মুত্তাকীদের ইমাম বলা হয়েছে। (৩) উজ্জল মুখ ও হাত-পা বিশিষ্টদের পথিকৃৎ (অর্থাৎ নেককারদের পথপ্রদর্শক) বলা হয়েছে। (ইযালাতুল খাফা)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হযরত আলীর (রা.)'র চেহারা দেখাও ইবাদত। [ইযালা]

নাসাঈ হযরত আলী (রা.) থেকে আরো বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আল্লাহর কসম! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, মু'মিন ছাড়া কেউ তোমার বন্ধু হবে না এবং মুনাফিক ছাড়া কেউ তোমার শত্রু হবে না।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে ইমাম তিরমিযী (র.) বর্ণনা করেন, আমরা মুনাফিক চিনতাম হযরত আলী (রা.)'র প্রতি শত্রুতা পোষণ থেকে। (ইযালাতুল খাফা)

হযরত উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, কোন মুনাফিক আলীর সাথে বন্ধুত্ব রাখবে না। তেমনি কোন মু'মিন তাঁর প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করবে না। (মুসলিম)

হযরত আলী (রা.)-এর ফযিলত অস্বীকার করার কোন উপায় নেই

আমির ইবন সা'দ ইবন ওক্কাস (রঃ) বলেন, আমার পিতা হযরত সা'দ (রা.) আমাকে এ ঘটনা শুনিয়েছেন যে, হযরত মু'আবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান (রা.) আমাকে হুকুম দিলেন এবং বললেন, আপনি আবু তুরাব (অর্থাৎ হযরত আলী (রা.) কে মন্দ বলেন না কেন? আমি বললাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী (রা.) সর্ম্পকে তিনটি এমন কথা বলেছেন যদি আমি তা হতে একটিও পেতাম তবে তা আমার নিকট লালবর্ণের উটের পাল পাওয়ার চেয়ে প্রিয় হত। সেই তিন কথা যতক্ষণ আমার স্মরণ থাকবে ততক্ষণ আমি তাকে মন্দ বলতে পারি না। এক. জেহাদের সফরে (অর্থাৎ গাযওয়ায়ে তবুকে) যাওয়ার সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী (রা.) কে মদীনায় নিজের স্থানে রেখে যেতে চাইলেন। হযরত আলী (রা.) তাঁর খিদমতে আরজ করলেন, ইয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি কি আমাকে মহিলা ও শিশুদের সাথে পিছনে রেখে যাচ্ছেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি কি সন্তুষ্ট নও যে তুমি আমার জন্য এমন হবে যেমন হযরত হারুন আলাইহিস সালাম হযরত মূসা আলাইহিস সালামের জন্য ছিলেন? পার্থক্য শুধু এটুকু যে, আমার পরে কেউ নবী হবে না।

এমনিভাবে খায়বারের যুদ্ধের সময় আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, আজ আমি এমন ব্যক্তিকে ঝাণ্ডা প্রদান করব, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মহব্বত করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাঁকে মহব্বত করেন। এই সম্মানের কথা শুনে আমার আগ্রহ হল, এই ঝাণ্ডা আমি লাভ করি এবং এই আগ্রহে আমি বারবার মাথা উঠাচ্ছিলাম। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার নিকট আলীকে ডেকে আন। হযরত আলী (রা.) আসলেন। তার চোখে অসুখ ছিল। তিনি তাঁর চোখে নিজের মুখের লালা লাগিয়ে দিলেন এবং তাঁকে ঝাণ্ডা প্রদান করলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাতে মুসলমানদের বিজয় দান করলেন। আর (তৃতীয় বিষয় হল) যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হল-

فقل تعالوا ندع ابنائنا وابنائكم ونسائنا ونسائكم وانفسنا وانفسكم– الاية

অর্থাৎ আর আপনি বলে দিন, আসো আমরা ডেকে নেই আমাদের সন্তানদেরকে এবং তোমাদের সন্তানদেরকে, আর আমাদের নারীদেরকে এবং তোমাদের নারীদেরকে এবং স্বয়ং আমাদেরকে ও স্বয়ং তোমাদেরকে, অতঃপর আমরা খুবই আন্তরিকতার সাথে এরূপে দু'আ করি যে, আল্লাহর লা'নত পড়ুক অসত্যপন্থীদের উপর। (সূরা আলে ইমরানঃ ৬৯) (ইযালাতুল খাফা)

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী (রা.), হযরত ফাতিমা (রা.), হযরত হাসান (রা.) ও হযরত হুসাইন (রা.) কে ডাকলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ, এরা আমার পরিবার। (আহমদ, মুসলিম, তিরমিযী)

আবু নাজীহ (রঃ) বলেন, হযরত মু'আবিয়া (রা.) যখন হজ্জে আসলেন তখন তিনি হযরত সা'দ ইবন আবি ওক্কাস (রা.) এর হাত ধরে বললেন, হে আবু ইসহাক! জিহাদের ব্যস্ততার কারণে আমরা কয়েক বছর হজ্জ করতে পারিনি। যে কারণে আমরা হজ্জের অনেক সুন্নত ভুলে যাচ্ছি। অতএব আপনি তওয়াফ করুন, আমরাও আপনার সাথে তওয়াফ করব। তওয়াফের পর হযরত মু'আবিয়া (রা.) তাকে নিজের সঙ্গে 'দারুন নাদওয়া'তে নিয়ে গেলেন এবং তাকে নিজের সিংহাসনের উপর বসালেন। তারপর হযরত আলী (রা.) এর সমালোচনা আরম্ভ করলেন এবং হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা.) সম্পর্কে অশোভনীয় কথা বলতে লাগলেন। হযরত সা'দ (রা.) বললেন, আপনি আমাকে আপনার ঘরে এনে নিজ সিংহাসনের উপর বসালেন, তারপর হযরত আলী (রা.) কে মন্দ বলতে আরম্ভ করলেন। আল্লাহর কসম, যদি হযরত আলী (রা.) এর তিনটি বিষয়ের একটিও আমি পাই তবে তা আমার নিকট সমগ্র দুনিয়া পাওয়া অপেক্ষা অধিক প্রিয় হবে। প্রথমতঃ তবুকের যুদ্ধে যাওয়ার সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী (রা.) কে বলেছিলেন, তুমি আমার জন্য এমন যেমন হযরত হারুন আলাইহিস সালাম হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এর জন্য ছিলেন, তবে পার্থক্য এই যে, আমার পরে কেউ নবী হবেন না । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি আমাকে এ কথা বলতেন তবে তা আমার নিকট সমগ্র দুনিয়া পাওয়ার চেয়েও অধিক প্রিয় ছিল।

দ্বিতীয়তঃ খায়বারের যুদ্ধের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে বলেছিলেন, আজ আমি এমন এক ব্যক্তিকে ঝাণ্ডা প্রদান করব, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মহব্বত করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাঁকে মহব্বত করেন এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাতে বিজয় দান করবেন। আর সে ময়দান হতে পলায়নকারী নয়। যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার সম্পর্কে এ কথাগুলো বলতেন তবে তা আমার নিকট সমগ্র দুনিয়া পাওয়ার চেয়ে অধিক প্রিয় হত।

তৃতীয় এই যে, (তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জামাতা ছিলেন) আমিও যদি তার জামাতা হতাম এবং তাঁর কন্যার সাথে আমার বিয়ে হত এবং হযরত আলী (রা.) এর ন্যায় তার কন্যা হতে আমারও দুই পুত্র হত তবে তা আমার নিকট সমগ্র দুনিয়া পাওয়ার চেয়ে অধিক প্রিয় হত। আমি আজকের পর কখনও আপনার ঘরে আসব না। এই বলে হযরত সা'দ (রা.) নিজের চাদর ঝেড়ে নিয়ে বের হয়ে গেলেন। (আল-বিদায়া ওয়ান-নেহায়া, খণ্ডঃ ৭, পৃষ্ঠাঃ ৩৪১, হায়াতুস সাহাবা, খণ্ডঃ ৩, পৃষ্ঠাঃ ৮৫২)

হযরত মু'আবিয়া (রা.)কে হযরত আলী (রা.) এর সাথে তুলনা করা মূর্খতার পরিচায়ক

এ প্রসঙ্গে আল্লামা আলাউদ্দীন আলী মুত্তাকী (রা.) (মৃত্যু: ৯৭৫ হিজরী) এর 'কানযুল উম্মাল কিতাব থেকে কিছু আলোচনা তুলে ধরা হল।

হযরত আবু উবায়দা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত মু'আবিয়া (রা.) হযরত আলী (রা.) এর নিকট লিখেছিলেন- হে আবুল হাসান! আমার অনেক সম্মান ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আমার পিতা জাহিলী যুগে নেতা ছিলেন। আর ইসলামী যুগে আমি বাদশাহ হয়েছি। আমি হচ্ছি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শ্যালক, সমগ্র মু'মিনদের খালু। আমি কাতিবে ওহী। এর জবাবে হযরত আলী (রা.) বললেন বললেন, হায়! কলিজা-খোরের ছেলে হয়ে আমার উপর শ্রেষ্টত্বের অহংকার করছো? এর পর তিনি তাঁর খাদিমকে বললেন, লিখ। এই বলে তিনি নিম্নোক্ত কবিতাটি বলেন-

محمد النبي أخي وصهري ٭ وحمزة سيد الشهداء عمي

وجعفر الذي يمسي ويضحي ٭ يطير مع الملائكة ابن أمي

وبنت محمد سكني وعرسي ٭ منوط لحمها بدمي ولحمي

وسبطا أحمد ولداي منها ٭ فأيكم له سهم كسهمي

سبقتكم إلى الإسلام طرا ٭ صغيرا ما بلغت أوان حلمي

فقال معاوية: أخفوا هذا الكتاب لا يقرأه أهل الشام فيميلون إلى ابن أبي طالب.

অনুবাদ: মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হচ্ছেন আমার ভাই ও আমার শ্বশুর। শহীদগণের সরদার হযরত হামযা (রা.) হচ্ছেন আমার চাচা।

হযরত জা'ফর (রা.) যিনি সকাল-সন্ধ্যা ফেরেশতাদের সাথে উড়ছেন তিনি আমার মায়ের ছেলে। (আমার আপন ভাই)

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মেয়ে হচ্ছেন আমার জীবন সঙ্গিনী, আমার সহধর্মিনী।

আহমদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দুই নাতী (ফাতিমার ঘরে) আমার সন্তান। তোমাদের কে আছো আমার মত ভাগ্যবান?

আমি তোমাদের সকলের আগে ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমি বাল্য বয়সে যখন সাবালক হইনি তখন ইসলাম গ্রহণ করেছি।

(বর্ণনাকারী বলেন) এ চিঠি দেখে হযরত মু'আবিয়া (রা.) বললেন, চিঠিটি গোপন রেখো যাতে শামবাসীরা তা পড়তে না পারে। তাহলে তারা আলী বিন আবু তালিবের প্রতি ঝুঁকে পড়বে। (কানযুল উম্মাল, খণ্ড: ১৩, পৃষ্ঠা: ৪৯, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ২৬-২৭)

প্রশ্ন হতে পারে যে, নিজে নিজের প্রশংসা করা ঠিক নয়, তাহলে হযরত আলী (রা.) কিভাবে নিজের প্রশংসা করলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লামা নববী (র.) 'আল-আযকার' কিতাবে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। নিম্নে তা উল্লেখ করা হল।

ذكرُ محاسن نفسه ضربان : مذموم، ومحبوب، فالمذمومُ أن يذكرَه للافتخار وإظهار الارتفاع والتميّز على الأقران وشبه ذلك؛ والمحبوبُ أن يكونَ فيه مصلحة دينية، وذلك بأن يكون آمراً بمعروف أو ناهياً عن منكر أو ناصحاً أو مشيراً بمصلحة أو معلماً أو مؤدباً أو واعظاً أو مذكّراً أو مُصلحاً بين اثنين أو يدفعُ عن نفسه شرّاً أو نحو ذلك، فيذكر محاسنَه ناوياً بذلك أن يكون هذا أقربَ إلى قبول قوله واعتماد ما يذكُره، أو أن هذا الكلام الذي أقوله لا تجدونه عند غيري فاحتفظوا به أو نحو ذلك، وقد جاء في هذا المعنى ما لا يحصى من النصوص

অনুবাদ: জেনে রাখো। নিজের প্রশংসা করা দু' প্রকার। একটি নিন্দনীয়, অপরটি প্রশংসনীয়। নিন্দনীয় হচ্ছে অহংকার বশত: এবং সমসাময়িক অন্যদের থেকে নিজেকে উঁচুমানের এবং আলাদা প্রকাশ করার জন্য প্রশংসা করা। আর প্রশংসিত পদ্ধতি হলো যে প্রশংসায় ধর্মীয় কোন সুবিধা জড়িত থাকে। যেমন সৎকাজের নির্দেশ দানকারী হিসেবে, অসৎ কাজ থেকে নিষেধকারী হিসেবে, কল্যাণকর কোন কাজের পরামর্শদাতা হিসেবে, শিক্ষক হিসেবে, আদব শিক্ষা দানকারী হিসেবে, উপদেশ দানকারী হিসেবে, দু'জনের মধ্যে বিরোধ মিমাংসাকারী হিসেবে, অথবা নিজের উপর আরোপিত কোন অকল্যাণকর কোন আশংকা দমনের জন্য কিংবা অনুরোপ কোন কারণে নিজের প্রশংসা করা উত্তম। এসব ক্ষেত্রে নিজের প্রশংসা করবে এজন্য, যাতে তার কথা শ্রোতার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। তাঁর কথার প্রতি নির্ভরতা প্রমাণের লক্ষে অথবা একারণে, যেন বক্তা বলছেন আমি যা বলছি তা অন্য কারো কাছে পাবে না। সুতরাং আমার কথা স্মরণ রাখো। অনুরোপ কারণে নিজের প্রশংসা করা যায়। এসব কারণে প্রশংসার অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। (আল-আযকার, পৃষ্ঠা: ৪৫২)

হযরত হাসান বিন আলী (রা.) এর ফযিলত

ইমাম হাসান বিন আলী (রা.) এর ফযিলতের কিছু আলোচনা তুলে ধরা কর্তব্য মনে করছি। হাফিয ইমাদ উদ্দীন ইবনে কাসীর (মৃত্যু-৭৭৪ হিজরী) রচিত আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া কিতাবে লেখেন-

তাঁর উপনাম ছিল আবূ মুহাম্মদ। তিনি হলেন কুরাইশী হাশিমী এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দৌহিত্র। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রাণপ্রিয় কন্যা ফাতিমা যাহরা (রা.) এর পুত্র। হযরত হাসান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুগন্ধী-সৌরভ। তাঁর চেহারার সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চেহারার সর্বাধিক মিল ছিল। তৃতীয় হিজরীর রমযান মাসের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন লালা মিলিয়ে তাঁর তাহনীক (মিষ্টিমুখ) করান। তিনি তাঁর নাম রাখেন হাসান। হযরত হাসান (রা.) হলেন তাঁর পিতা-মাতার জ্যেষ্ঠ সন্তান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসান (রা.) কে অত্যন্ত আদর করতেন। এমনকি হযরত হাসানের শৈশবাবস্থায় তিনি তাঁর ঠোঁটে চুমু খেতেন। কখনো কখনো তিনি হাসানের জিহবা চুষতেন। কোলাকুলি করতেন এবং তাঁর সাথে হাসি-কৌতুক করতেন। মাঝে মাঝে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযে রত থাকাবস্থায় হযরত হাসান আসতেন এবং রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পিঠে চড়ে বসতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে পিঠে বসিয়ে রাখতেন এবং তাঁরই কারণে সিজদায় দেরী করতেন। কখনো কখনো হযরত হাসান (রা.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে মিম্বরে উঠে বসতেন। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড:৮, পৃষ্ঠা:৭৩)

বুখারী শরীফে হযরত আবূ আসিম উকবাহ ইবনে হারিস থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওফাতের কয়েকদিন পরের ঘটনা। হযরত আবূ বকর (রা) মুসল্লীদেরকে নিয়ে আসরের নামায আদায় করলেন। এরপর তিনি এবং আলী (রা) পায়ে হেঁটে যাত্রা করলেন। হযরত আবূ বকর (রা) দেখতে পেলেন যে হযরত হাসান (রা) অন্য বাচ্চাদের সাথে খেলা করছেন। তিনি হযরত হাসানকে কাঁধে তুলে নিলেন এবং বলতে লাগলেন,'ওহ বাবা! এ যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মত, আলী (রা.) এর মত নয়। হযরত আলী (রা) এ কথা শুনছিলেন আর হাসছিলেন। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ৭৪)

ইমাম আহমদ হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত হাসানের বুক থেকে মাথা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে সবচাইতে বেশি মিল ছিল আর হযরত হুসাইনের বুক থেকে নিম্নের দিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-সথে অধিক মিল ছিল। ইমাম তিরমিযী (র.) এটি ইসরাঈল সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন, তিনি বলেছেন যে, এটি গরীব পর্যায়ের হাদীস।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে মদীনায় এক বাজারে উপস্থিত ছিলাম । তিনি বাজার থেকে ফিরে এলেন। আমিও তাঁর সাথে ফিরে এলাম। তিনি হযরত ফাতিমার ঘরের আঙ্গিনায় এসে ডেকে বললেন, হে আমার ছেলে! হে আমার ছেলে! কিন্তু কেউ কোন উত্তর দিল না। তিনি এগিয়ে গিয়ে উঠানে বসলেন। একটু পর হযরত হাসান (রা.) এলেন। আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, আমার মনে হয় গলায় মালা পরিয়ে দেওয়ার জন্যে এতক্ষণ মা ফাতিমা তাঁকে ধরে রেখেছিলেন। হযরত হাসান (রা.) এলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তিনিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জড়িয়ে ধরলেন। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, اني احبه واحب من يحبه– 'আমি একে ভালবাসি এবং যে ব্যক্তি একে ভালবাসে আমিও তাকে ভালবাসি। তিনি এ কথাটি তিনবার বললেন। তাঁরা দু'জনে এই হাদীসটি সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না সূত্রে আব্দুল্লাহ থেকে উদ্ধৃত করেছেন। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া,খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ৭৫)

ইমাম আহমদ (র:) বলেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, একদিন আমার হাতে ভর করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বানূ কায়নুকার বাজারে গেলেন। এরপর বাজার থেকে ফিরে এলেন এবং কাপড় মুড়ি দিয়ে মসজিদে বসে রইলেন। এরপর বললেন, বাছাধন কোথায়? ওকে ডেকে আমার নিকট নিয়ে এসো। হযরত হাসান (রা.) এলেন। তিনি এলেন লাফিয়ে লাফিয়ে, দৌড়ে দৌড়ে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কোলে ঝাপিয়ে পড়লেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মুখে হাসানের জিহবা ঢুকিয়ে দিলেন এবং বললেন- اللهم اني احبه فاحبه واحب من يحبه– 'হে আল্লাহ! আমি একে ভালবাসি, সুতরাং আপনিও তাকে ভালবাসুন এবং যে তাকে ভালবাসবে তাঁকেও ভালবাসুন।' এটি তিনি তিনবার বলেছিলেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি যখনই হযরত হাসান (রা.)কে দেখতাম আদরে স্নেহে ভালবাসায় আমার দু'চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ত। আমি কেঁদে ফেলতাম।' এই হাদীসটি ইমাম মুসলিমের শর্ত পূরণ করে, তবে তিনি এটি তাঁর গ্রন্থে উদ্ধৃত করেননি। এভাবে সুফিয়ান সাওরীও (রা.) এটি নাঈম হতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

হযরত হাফসা সূত্রে আবূ হাযিমের মাধ্যমে আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, من احب الحسن والحسين فقد احبني ومن ابغضهما فقد ابغضني– 'যে ব্যক্তি হাসান ও

হুসাইনকে ভালবাসে সে মূলত আমাকেই ভালবাসে আর যে ব্যক্তি ওদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, সে মূলত আমার প্রতিই বিদ্বেষ পোষণ করে।' অবশ্য এই সনদে এটি গরীব পর্যায়ের হাদীস। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া,খণ্ডঃ ৮, পৃষ্ঠা:৭৬)

আবূ ইয়ালা আবূ হাশিম ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত হাসান (রা.) কে কাঁধে চড়িয়ে বাইরে বের হলেন। তা দেখে এক লোক বললেন, হে বৎস! কতই না উত্তম বাহনে তুমি আরোহন করেছো! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এবং কত উত্তম এই আরোহী।' (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ডঃ ৮, পৃষ্ঠা: ৭৮)

হযরত হাসান (রা.) কর্তৃক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হযরত উসমান (রা.)-এর হেফাযত

শেষ জীবনে হযরত উসমান (রা.) যখন কার্যত গৃহবন্দী অবস্থায় তখন হযরত হাসান (রা.) অন্যদের সাথে গলায় তরবারি ঝুলিয়ে বিদ্রোহীদের আক্রমন থেকে তাঁকে রক্ষা করার জন্যে খলীফার দরজায় প্রহরারত ছিলেন। এতে খলীফা উসমান (রা.) আশংকা করলেন, না জানি বিদ্রোহীদের আক্রমণে হযরত হাসান (রা.) এর কোন ক্ষতি হয়। তাই তিনি কসম করে তাঁকে নিজ গৃহে ফিরে যাবার অনুরোধ করলেন। খলীফা উসমান (রা.) এ অনুরোধ করেছিলেন হযরত আলী (রা.) এর মানসিক প্রশান্তির লক্ষে এবং হযরত হাসান (রা.) এর জীবনের ঝুঁকির আশংকায়। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ,খণ্ডঃ৮, পৃষ্ঠা:৮০)

হযরত হাসান (রা.)কে আলী (রা.) এর নসিহত:

অজ্ঞতার চাইতে কঠিন দারিদ্র্য নেই। বিদ্যার চাইতে উত্তম সম্পদ নেই। আত্মপ্রীতির চাইতে ভয়ানক নির্জনতা নেই। পরামর্শের চাইতে কার্যকর সাহায্য নেই। পরিকল্পনার ন্যায় কোন বুদ্ধিমত্তা নেই। সৎ চরিত্রের ন্যায় কোন আভিজাত্য নেই। আত্মরক্ষার ন্যায় পরহেযগারী নেই। ধ্যানের ন্যায় কোন ইবাদত নেই। লজ্জার ন্যায় কোন ঈমান নেই। ঈমানের মূল হল সবর ও ধৈর্য। কথার বিপদ হল মিথ্যা বলা। বিদ্যার বিপদ হল ভুলে যাওয়া। সহনশীলতার বিপদ হল অজ্ঞতা। ইবাদতের বিপদ হল বিরতি দেয়া। দানশীলতার বিপদ হল গর্ব করা। বীরত্বের বিপদ হল বিদ্রোহ করা। ভালোবাসার বিপদ হল দম্ভ করা।(আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ডঃ ৮ পৃষ্ঠা: ৮৬)

অন্তিম মুহূর্তে হযরত হাসান (রা.) এর মূল্যবান উক্তি

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রাকাবাহ ইবনে মুসকালাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত হাসান (রা.) যখন মৃত্যু পথযাত্রী, তখন তিনি বললেন, তোমরা আমাকে উঠানে নিয়ে যাও, আমি আল্লাহর এই বিশাল জগত দেখে নেই। তারা বিছানাসহ তাঁকে উঠানে নিয়ে এলেন। তিনি উপরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহ! আমি আমার প্রাণ বিসর্জনের বিনিময়ে আপনার নিকট সওয়াব কামনা করছি। কারণ এটি আমার অত্যন্ত প্রিয় বস্তু। বর্ণনাকারী বলেন, বস্তুত মহান আল্লাহ তাঁর যে পরিণতি ঘটালেন তার বিনিময়ে তিনি আল্লাহর নিকট সওয়াব কামনা করলেন। আবূ নু'আইম বলেছেন, হযরত হাসান (রা.) এর বেদনা যখন বেড়ে গেল, তখন তিনি খুব অস্থির হয়ে পড়লেন। তখন একজন লোক তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে আবূ মুহাম্মদ! এত অস্থিরতা, ধৈর্যহীনতা কেন? এখন শুধু এটুকু হবে যে, আপনার দেহ থেকে প্রাণ পৃথক হবে আর তারপর আপনি পৌঁছে যাবেন আপনার পিতা-মাতা আলী ও ফাতিমা (রা.) এর নিকট, আপনার নানা-নানী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খাদীজা (রা.) এর নিকট। আপনার চাচা হামযা ও জাফরের নিকট, আপনার খালা রুকাইয়া, উম্মু কুলসুম ও যায়নাব (রা.) এর নিকট। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে হযরত হাসান (রা.) সুস্থির হয়ে উঠলেন। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ডঃ ৮ পৃষ্ঠা: ৯২)

হযরত হাসান (রা.)-এর ইন্তেকালে সাহাবায়ে কিরামের শোক পালন

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, মুসাবির বলেছেন, যেদিন ইমাম হাসান (রা.) এর মৃত্যু হল সেদিন হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কে দেখেছি মসজিদে নববীতে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে করে বলছিলেন, হে লোক সকল! আজ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরম স্নেহধন্য প্রিয় মানুষের ওফাত হল। তোমরা সকলে তার জন্য কাঁদো। তাঁর জানাযায় সর্বস্তরের মানুষ সমবেত হয়। মনে হচ্ছিল যেন, 'জান্নাতুল বাকী'তে দাড়ানোর জায়গা ছিল না। এই মহান ব্যক্তির ইন্তেকালে অনবরত সাত দিন নারী পুরুষ সকলে কেঁদেছে। বানূ হাশিম গোত্রের মহিলাগণ তাঁর শোকে এক মাস যাবত কেঁদেছেন, শোক পালন করেছেন। এ সময়ে তারা সকল প্রকারের সাজ-সজ্জা বর্জ্জন করেছিলেন।(আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৯৪)

হযরত হাসান (রা.)-এর ইন্তিকালে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর প্রতিক্রিয়া

হযরত হাসান (রা.) এর ইন্তিকালের সংবাদ শুনে হযরত মু'আবিয়া (রা.) যে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন তা ইবনে খাল্লিকান 'ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান কিতাবে নিম্নরূপ আলোচনা করেন।

ولما كتب مروان إلى معاوية بشكاته كتب إليه أن أقبل المطي إلي بخبر الحسن ولما بلغه موته سمع تكبيرا من الحضر فكبر أهل الشام لذلك التكبير فقالت فاختة زوجة معاوية أقر الله عينك يا أمير المؤمنين ما الذي كبرت له قال مات الحسن قالت أعلى موت ابن فاطمة تكبر قال والله ما كبرت شماتة بموته ولكن استراح قلبي وكان ابن عباس بالشام فدخل عليه فقال يا ابن عباس هل تدري ما حدث في أهل بيتك قال لا أدري ما حدث إلا أني أراك مستبشرا وقد بلغني تكبيرك وسجودك قال مات الحسن قال إنا لله يرحم الله أبا محمد ثلاثا ثم قال والله يا معاوية لا تسد حفرته حفرتك ولا يزيد نقص عمره في يومك وإن كنا اصبنا بالحسن لقد أصبنا بإمام المتقين وخاتم النبيين فسكن الله تلك العبرة وجبر تلك المصيبة وكان الله الخلف علينا من بعده وكان أوصى لأخيه الإمام الحسين: وفيات الأعيان

(ইবনে খাল্লিকান বলেন) হযরত হাসান (রা.) যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন মারওয়ান ইবনে হাকাম (মদীনার গভর্নর) হযরত মু'আবিয়াকে সংবাদ দেন যে, হাসান (রা.) অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তখন মু'আবিয়া (রা.) বলেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর সংবাদটি আমাকে সত্বর অবহিত করিও। হযরত হাসান (রা.)-এর ইন্তিকালের সংবাদ শুনে হযরত মু'আবিয়া (রা.) অতি উচ্চ স্বরে তাকবীর ধ্বনি দিয়েছিলেন। যা আল-হাদরা পর্যন্ত শোনা গিয়েছিল। এই তাকবীর শুনে সিরিয়াবাসীরাও উচ্চ স্বরে তাকবীর ধ্বনি দিয়েছিল। এই অবস্থা দেখে মু'আবিয়া (রা.)-এর স্ত্রী ফাখতাহ বিনতে কুরাইজ মু'আবিয়া (রা.)-কে বলেছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা আপনার চক্ষু শীতল করুন। কী কারণে আপনি এই তাকবীর উচ্চস্বরে দিলেন? তিনি বললেন, হাসান ইবনে আলীর ইন্তিকাল হয়েছে। ফাখতাহ বললেন, কী আশ্চর্য! হাসান ইবনে আলীর ইন্তিকালে আপনি তাকবীর দিলেন? হযরত মু'আবিয়া (রা.) বললেন, তাঁর ইন্তিকালে আমি আনন্দিত হয়ে তাকবীর দেইনি, আমার অন্তরের প্রশান্তির জন্য তাকবীর দিয়েছি। এই মুহূর্তে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) আগমন করলেন। হযরত মু'আবিয়া (রা.) তাকে

বললেন- কোন খবর জানেন কি? আহলে বাইতে দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। তিনি বললেন, না তো, কিছুই জানি না। কী হয়েছে? তবে আমি আপনার তাকবীর শুনেছি এবং অন্য যে কোন সময়ের চাইতে আপনাকে খুব আনন্দিত দেখাচ্ছে। হযরত মু'আবিয়া (রা.) বললেন, হাসানের ইন্তিকাল হয়েছে। এই কথা শুনে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, আল্লাহ তা'আলা হাসানের প্রতি রহম করুন। এই দু'আ তিনি তিনবার উচ্চারণ করলেন।

অত:পর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, হে মু'আবিয়া! হাসানের গর্তে আপনার গর্ত ভর্তি হবে না। আর না তাঁর জীবন আপনার জীবনের সাথে যোগ হবে। হযরত হাসান (রা.)-এর ইন্তিকালে আমি অত্যন্ত মর্মাহত। ইতিপূর্বে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইন্তিকালেও এর চাইতে বেশি মর্মাহত হয়েছিলাম, কষ্ট পেয়েছিলাম। আল্লাহ তা'আলা এই অনাকাঙ্খিত ঘটনার ক্ষতিপূরণ দিয়ে ধৈর্য ধারণের তাওফীক দিন। এখন তাঁর পরে আল্লাহ তা'আলাই আমাদের খলীফা, রক্ষক ও শাসক। (ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান)

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার ব্যাপারে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ-

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সংগে আবূ সায়ফ কর্মকারের কাছে গেলাম। তিনি ছিলেন (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ছাহেবজাদা) ইব্রাহীম (রা.)-এর দুধ সম্পর্কীয় পিতা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযতে ইবরাহীম (রা.)কে তুলে নিয়ে চুমু খেলেন। এরপর (আর একদিন) আমরা তার (আবূ সায়ফ-এর) বাড়ীতে গেলাম। তখন ইবরাহীম (রা.) মুমূর্ষ অবস্থায়। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উভয় চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে লাগলো। তখন আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনিও? (কাঁদছেন?) তিনি বললেন ঃ ইবনে আউফ, এ হচ্ছে মায়া-মমতা। তারপর পুনর্বার অশ্রু ঝরতে থাকলো, এরপর তিনি বললেন: অশ্রু প্রবাহিত হয় আর হৃদয় হয় ব্যথিত। তবে আমরা মুখে তা-ই বলি যা আমাদের রব পছন্দ করেন। আর হে ইব্রাহীম! তোমার বিচ্ছেদে আমরা অবশ্যই শোকাভিভূত। (বুখারী)

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়ায় থাকলে হযরত ইব্রাহীম (রা.)-এর ইন্তিকালে যতটুকু ব্যথিত হয়েছিলেন, হাসান (রা.)-এর ইন্তিকালে তার চেয়ে কোন অংশেই কম ব্যথিত হতেন না।

এ করনেই হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হাসান (রা.)-এর ওফাতের সংবাদ শুনে এতো কষ্ট পেয়েছিলেন, যা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসরণে ছিল।

তরজমানুল কুরআন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) -এর ফযিলত

তিনি হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম ইবনে আবদে মনাফ ইবনে কুসাই আবুল আব্বাস আল-হাশিমী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চাচাতো ভাই। এই উম্মতের জ্ঞানের সাগর। আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যাকারী ও মুখপাত্র। তাঁকে 'আল হিবরু'(জ্ঞানী) এবং 'আল-বাহরু' (জ্ঞানের সাগর) বলা হত। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম থেকেও অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবার তাঁর থেকে অনেক সাহাবী ও তাবিঈ হাদীস গ্রহণ করেছেন। ইলমের গভীরতা, প্রজ্ঞার আধিক্য, জ্ঞানের পরিপূর্ণতা, মর্যাদার ব্যাপকতা এবং বংশের আভিজাত্যের কারণে তিনি এমন কিছু একক গুণে গুণান্বিত, যার সমাহার তিনি ব্যতীত অন্য কোন সাহাবীর মধ্যে নেই। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তিনিও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। (আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়া, খণ্ডঃ ৯, পৃষ্ঠাঃ ২৯৭)

হাম্মাদ ইবনে সালামা হতে বর্ণিত, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আমি আমার খালা মাইমুনার ঘরে রাত যাপন করি। রাতে আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য পানি রেখে দেই। তা দেখে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, এটা কে রাখল ? লোকেরা বলল, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস। নবী করীম (সা.) বললেন, 'হে আল্লাহ! তুমি তাঁকে ব্যাখ্যা করার জ্ঞান (তাফসীরের জ্ঞান) দান কর। ইবনে খাইসাম থেকে এ হাদীসটি হুবহু এভাবে আরো অনেকে বর্ণনা করেছেন। (বুখারী, মুসলিম)

সাওরী প্রমুখ লাইস ও আবু জাহদাম মূসা ইবনে সালিম সূত্রে ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে আব্বাস (রা.) জিবরীলকে দেখেছেন। (তিরমিযী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, হে আল্লাহ! একে তুমি হিকমত শিক্ষা দাও। (বুখারী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হলেন হাশিমী। বনূ হাশিমের সম্মানার্থেই তাঁদের উপর সদকা গ্রহণ করা হারাম করা হয়েছে। এ মর্যাদা প্রথমত উর্ধ্বতন বংশধরদের জন্য সাব্যস্ত হয়। অতঃপর তাদের মাধ্যমে তাদের সন্তানদের জন্য এ মর্যাদা প্রজোয্য। বনূ হাশিমকে সম্মান প্রদর্শন ও মর্যাদা প্রদান করা আবশ্যক হওয়ার করণ হলো, তারা জাহিলি যুগে ও ইসলামি যুগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সাহায্য-সহায়তা করেছিলেন।

এ প্রসঙ্গে হেদায়া কিতাব থেকে কিছু আলোচনা পেশ করা হল-

বনূ হাশিমকে যাকাত দেবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "হে বনূ হাশিম! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য মানুষের এঁটো পানি এবং তাদের ময়লা হারাম করেছেন এবং তার বিনিময়ে তোমাদেরকে পঞ্চমাংশ দান করেছেন।"

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, হাশিমী হচ্ছেন- হযরত আলী, আব্বাস, জাফর, 'আকীল ও হারিস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রা.)-এর পরিবার এবং তাদের আযাদকৃত গোলামগণ। (হেদায়া, কিতাবুয্ যাকাত)

হযরত হুসাইন (রা.)-এর ফযিলত ও গুণাবলী

বেহেশেতি যুবকদের সর্দার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কলিজার টুকরো হযরত হুসাইন বিন আলী (রা.) এর ফযিলত সম্পর্কে হাফিয ইমাদ উদ্দিন ইবনে কাসীর (র.)-এর আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া কিতাব থেকে কিছু আলোচনা পেশ করা হলো।

ইমাম বুখারী (র.) শু'বা ইবনে আবূ নু'আইম (র.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে শুনেছি, এক ইরাকী ব্যক্তি মাছি হত্যা করার অবৈধতা প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করল। তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন, 'ইরাকীরা মাছি হত্যার বিষয়ে প্রশ্ন করছে, অথচ তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কন্যার সন্তানকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "তারা দু'জন (ইমাম হাসান ও হুসাইন রা.) হলেন দুনিয়ার দু'টি ফুল।" ইমাম তিরমিযি (র.) উক্ত হাদীসটি বিশুদ্ধ সনদে উকবা ইবনে মুকরিম হতে বর্ণনা করেছেন। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ডঃ ৮, পৃষ্ঠাঃ ৩৮২)

ইমাম তিরমিযী (র.) মাহমূদ ইবনে গায়লান হযরত আল-বার (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, "একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন (রা.)-এর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং বলেন,'হে আল্লাহ ! আমি তাদের দু'জনকে ভালবাসি, আপনিও তাদেরকে ভালবাসুন।" তারপর ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, হাদীসটি বিশুদ্ধ।

ইমাম আহমদ (র.) যায়েদ ইবনে আল-হুজর ......হযরত বুরাইদা (রা.) ও তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সামনে খুতবা দিচ্ছিলেন, এমন সময় হযরত হাসান (রা.) ও হযরত হুসাইন (রা.) আগমন করলেন। তাঁদের দু'জনের পরনে ছিল লাল

জামা। তাঁরা দু'জন হাটছিলেন এবং হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে দেখে মিম্বর থেকে নেমে গেলেন, তাঁদেরকে উঠিয়ে নিলেন এবং তাঁদেরকে তাঁর সামনে বসালেন আর বললেন, 'আল্লাহ তা'আলা ঠিকই বলেছেন- অর্থাৎ "তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষা।" আমি এ দু'টি বাচ্চার দিকে তাকালাম, তাঁরা হাটছিল এবং হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল। তাই আমি ধৈর্য ধারণ করতে পারলাম না। আমি আমার কথা বন্ধ করে দিলাম এবং তাদেরকে উঠিয়ে নিলাম। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদীস গরীব এবং শুধুমাত্র আল হুসাইন ইবনে ওয়াকিদ ছাড়া অন্য কোন সূত্রে এটি বর্ণিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড ৮ঃ পৃষ্ঠা ৩৮৩)

ইমাম তিরমিযী (রা.) হাসান ইবনে আরদা ....ইয়ালা ইবনে মুররাহ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "হুসাইন আমার এবং আমি হুসাইনের। যে হুসাইনকে মহব্বত করবে আল্লাহ তাকে মহব্বত করবেন। হুসাইন (রা.) শ্রেষ্ঠ দৌহিত্র।" তারপর ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

ইমাম আহমদ (র.) সুলাইমান ......আতা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, একদিন এক ব্যক্তি তাঁকে সংবাদ দিল যে, সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখেছে, তিনি হযরত হাসান (রা.)ও হযরত হুসাইন (রা.)-কে বুকে টেনে নিচ্ছেন এবং বলছেন, "হে আল্লাহ! আমি এ দু'জনকে ভালবাসি। তাই তুমিও তাঁদেরকে ভালবাস।"

ইমাম আহমদ (র.) অন্য এক সনদে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে ইশার নামায আদায় করছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সিজদাহ করতেন তখন হযরত হাসান ও হুসাইন (রা.) তাঁর পিঠে চড়ে বসতেন। যখন তিনি মাথা উঠাতেন তখন তাদেরকে তিনি খুব নরম হাতে ধরতেন ও যমীনে রেখে দিতেন। তারপর তিনি যখন আবার সিজদাহ করতেন তখন তাঁরা আবারো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পিঠে চড়ে বসতেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিজদাহ হতে উঠার সময় তাঁদের নরম হাতে ধরতেন ও যমীনে রেখে দিতেন। এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত শেষ করলেন এবং তাঁদের দু'জনকে কোলে বসালেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকটবর্তী হলাম এবং বললাম হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি তাদের দু'জনকে তাদের মায়ের কাছে ফেরত পৌছিয়ে দেবো?

আবূ হুরায়রা (রা.) বললেন, এমন সময় বিদ্যুৎ চমকে উঠল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের দু'জনকে বললেন, যাও তোমরা তোমাদের মায়ের কাছে চলে যাও। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বললেন, বিদ্যুতের আলো থাকতে থাকতেই তাঁরা দু'জন তাঁদের মায়ের কাছে চলে গেলেন। মূসা ইবনে উসমান আল হাদরামী, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) এবং আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতেও প্রায় এ ধরনের বর্ণনা এসেছে।

আবূ দাউদ তায়ালিসী (র.) অন্য এক সনদে হযরত আলী (রা.) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) এ দু'জনকে সম্মান করতেন, কোলে উঠিয়ে নিতেন, তাঁদেরকে উপঢৌকন প্রদান করতেন, যেমন তাঁদের পিতাকে উপঢৌকন প্রদান করতেন।

একবার ইয়ামন থেকে কিছু চাদর আসল। হযরত উমর (রা.) সাহাবীদের পুত্রদের মধ্যে এগুলো বন্টন করে দিলেন কিন্তু এ চাদরগুলো হতে হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন (রা.)-কে কিছুই দিলেন না এবং বললেন, এগুলোর মধ্যে কোন একটিই তাঁদের উপযুক্ত নয়। তারপর তিনি ইয়ামনের গভর্নরের কাছে লোক প্রেরণ করলেন এবং তাঁদের উপযুক্ত দু'টি চাদর সংগ্রহ করে দিতে আদেশ দিলেন। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ডঃ ৮, পৃষ্ঠা : ৩৮০-৩৮৫)

ইমাম হাসান ও হোসাইন (রা.)'র নিকট থেকে হযরত ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)'র ফয়েয লাভ

আহলে বাইতের অনুসরণ ও তাঁদের সাথে ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে তাদের জীবদ্দশাতে যেমনিভাবে তাদের কাছ থেকে উপকৃত হওয়া যায়, তেমনিভাবে ইহধাম ত্যাগ করার পরেও তাদের কাছ থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (১১১৪-১১৭৬ হিজরী) (র.)'র একটি স্বপ্ন যা তাঁর রচিত 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ', 'ফুয়ূযুল হারামাইন' ও 'দুররে সামীন' কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে, যার দ্বারা বিষয়টি আরো স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। নিম্নে স্বপ্নটি উল্লেখ করা হলো-

১১৪৪ হিজরীর সফর মাসের দশম রাত্রিতে মক্কা মুকাররামায় আমি এক স্বপ্ন দেখলাম। দেখলাম হযরত হাসান ও হুসাইন (রা.) আমার ঘরে তাশরীফ আনলেন। ইমাম হাসান (রা.)-এর হাতে একটি কলম, যার অগ্রভাগ (নিব) ভাঙ্গা। তিনি আমাকে কলমটি প্রদান করার জন্য হাত বাড়ালেন এবং বললেন, এটি আমার নানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কলম। হুসাইন

(রা.) কলমটি মেরামত করার পরই তা আপনাকে প্রদান করা হবে। তিনি আরো বললেন, হুসাইন (রা.) কলমটি যেভাবে মেরামত করবেন আর কেউ এমনটি পারবে না। অতঃপর ইমাম হুসাইন (রা.) কলমটি হাতে নিয়ে তা মেরামত করে আমাকে প্রদান করলেন। আমি তাতে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। তারপর একখানা রেখা টানা চাদর নিয়ে আসা হল, যার একটি রেখা সবুজ ও অপর রেখাটি সাদা। চাদরখানা উভয়ের সম্মুখে রাখা হল। হযরত ইমাম হুসাইন (রা.) চাদরখানা হাতে নিলেন এবং বললেন এ চাদরখানা আমার নানা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের । অতঃপর চাদরখানা সম্মানার্থে আমি আমার মাথার উপর রাখলাম আর আল্লাহর প্রশংসা করলাম এবং সাথে সাথে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে গেলাম। (ফুযূযুল হারামাইন, দুররে সামীন ও হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহর ভূমিকা থেকে সংকলিত)

'দুররুস সামীন' কিতাবে তিনি এ স্বপ্ন বর্ণনার করার পর লেখেন- فمن يومئذ انشرح صدري التصنيف في علوم الشرعية (الدر الثمين) অর্থাৎ 'আর সেদিন থেকেই শরয়ী জ্ঞান সম্বলিত রচনার ক্ষেত্রে আমার বক্ষ সম্প্রসারিত হয়ে গেল। (আদদুররুস সামীন, পৃষ্ঠাঃ ২০)

হযরত জয়নুল আবেদীন (রা.)'র সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ইবনে খাল্লিকান বলেন, জয়নাল আবেদীন তাঁর পিতার সাথে কারবালার ময়দানে অবস্থান করেন। তাঁর বয়স কম হওয়ায়- কেউ কেউ বলেন তিনি পীড়িত থাকায়- বেঁচে যান। তাঁর বয়স ছিল তখন ২৩ বছর। কেউ কেউ বলেন, তাঁর বয়স ছিল ২৩ বছরের অধিক।

আল্লামা আল-ওয়াকিদী বলেন, তিনি ছিলেন লোকজনের মধ্যে বেশী পরহেযগার, বেশী ইবাদতগুযার এবং মহান আল্লাহর ভয়ে বেশী ভীতসন্ত্রস্ত। যখন তিনি চলাফেরা করতেন তিনি গর্ববোধ বা অহংকার করতেন না। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ডঃ ৯পৃষ্ঠাঃ১৭৪)

হযরত জয়নুল আবেদীন (রা.)'র খিদমতে খালক এবং গোপন সদকাহঃ

মুহাম্মদ ইবন ইসহাক বলেন, কতিপয় লোক পবিত্র মদীনায় খুব সুখে জীবন যাপন করতেন। কিন্তু তারা জানতেন না কোথা হতে তারা জীবনোপকরণ পেতেন এবং কে তাদেরকে এ জীবনোপকরণ সরবরাহ করতেন। তবে আলী ইবন হুসাইন (রা.) যখন ইন্তিকাল করেন, তখন তারা এ সুযোগ হারিয়ে ফেলে এবং তারা বুঝতে পারে যে, তিনিই ঐ ব্যক্তি যিনি রাতের বেলায় তাদের যাবতীয় সামগ্রী তাদের ঘরে পৌঁছিয়ে দিতেন। তিনি যখন ইন্তিকাল করেন, তখন পরিবারের সদস্যরা তার পিঠে

ও হাতে বোঝা বহন করার দাগ দেখতে পেলেন। তিনি বিধবা এবং মিসকীনদের ঘরে রাতের বেলা বোঝা পৌঁছিয়ে দিতেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি পবিত্র মদীনায় ১০০টি পরিবারের রসদ সরবরাহ করতেন । কিন্তু তারা তাঁর ওফাত পর্যন্ত সরবরাহকারীকে জানত না। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ডঃ ৯, পৃষ্ঠাঃ ১৭৫)

হযরত জয়নুল আবেদীন (রা.)'র ধৈর্যশীলতা ও উদারতা

আলী ইবনে হুসাইন (রা.) একদিন মসজিদ থেকে বের হন, তখন একটি লোক তাকে গালি দিল। লোকজন তাকে তাড়া করল। আলী ইবন হুসাইন (রা.) বলেন, তাকে তোমরা ছেড়ে দাও। তারপর তিনি তাকে সম্বোধন করেন এবং বলেন, তোমার কাছে আল্লাহ তা'আলা আমাদের যেসব দোষত্রুটি লুকিয়ে রেখেছেন তা অনেক। তোমার কি কোন প্রয়োজন আছে যা দূর করার জন্য আমি তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারি? লোকটি তখন লজ্জাবোধ করতে লাগল। তারপর তিনি তার গায়ের কালো চাদরটি দিয়ে দেন ও তাকে এক হাজার দিরহাম দেওয়ার হুকুম দেন। এরপর লোকটি যখনই আলী ইবন হুসাইনকে দেখতেন, তখনই বলতেন, আপনি তো নবীর সন্তান। (সিফাতুস সাফওয়াহ, খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ৪৭; জামাল উদ্দিন আবি ফারজ ইবনে জাওযী (৫১০-৫৯৮)।

হযরত জয়নুল আবেদীন (রা.)'র মূল্যবান নসীহত

একবার ইমাম জয়নুল আবেদীন (রা.) তাঁর ছেলেকে বলেন, ফাসিকের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে না। কেননা, সে তোমাকে এক টুকরা খাদ্যের বিনিময়ে বিক্রি করে দেবে। এমনকি তার চেয়ে কম মূল্যমানের বস্তুর বিনিময়েও তোমাকে বিক্রি করবে, যা সে অর্জন করতে চাইবে। তুমি কোন কৃপণ ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে না। কেননা, সে তোমাকে তার কাছে রাখা তোমার প্রয়োজনীয় সম্পদের অপমান করবে। কোন মিথ্যুকের সাথেও বন্ধুত্ব স্থাপন করবে না। কেননা, সে মরীচিকার ন্যায় দূরে অবস্থিত লোককে তোমার নিকটে দেখাবে। আর নিকটে অবস্থিত লোককে তোমার থেকে অনেক দূরে দেখাবে। কোন বোকা লোকের সাথেও তুমি বন্ধুত্ব স্থাপন করবে না। কেননা, সে তোমার উপকার করতে গিয়েও তোমার ক্ষতি করে বসবে। কোন সম্পর্কচ্ছেদকারীর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে না। কেননা, সে মহান আল্লাহর কিতাবে মালঊন বলে অভিহিত হয়েছে। (সিফাতুস সাফওয়াহ, খণ্ডঃ ২য়, পৃষ্ঠাঃ ৪৭)

ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল আনসারী বলেন, আলী ইবন হুসাইন ছিলেন শ্রেষ্ঠ হাশিমী। তাকে আমি বলতে শুনেছি তিনি বলতেন, হে মানবমণ্ডলী! তোমরা

আমাদেরকে ইসলামের জন্য ভালবাস। আমরা সম্ভ্রমে লজ্জিত হওয়া পর্যন্ত যেন তোমাদের মহব্বত আমাদের জন্যে সব সময় অক্ষুণ্ণ থাকে। অন্য এক বর্ণনায় আছে, যতক্ষণ না তোমরা জনগণের কাছে আমাদের জন্যে হিংসার পাত্র হয়ে উঠবে। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড: ৯, পৃষ্ঠা: ১৭৮)

ইয়াকুব (আ:) এর সাথে ইমাম জয়নুল আবেদীন (রা.)'র সাদৃশ্য

ইতিহাসবিদগণ উল্লেখ করেন, হযরত যয়নুল আবেদীন (রা.) ছিলেন অধিকাংশ সময়ে ক্রন্দনকারী। তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'ইয়াকুব (আ.) ইউসুফ (আ.) এর জন্য ক্রন্দন করতেন এবং তাঁর চোখ সাদা বা দৃষ্টিহীন হয়ে গিয়েছিল অথচ তিনি জানতেন না যে ইউসুফ (আ.) ইন্তিকাল করছেন কি না। অন্যদিকে আমি আমার পরিবারের তের জনের অধিক সদস্যকে আমার সামনে একটি সকাল বেলায় শহীদ হয়ে যেতে দেখেছি। তোমরা কি মনে করছ তাদের শোক আমার অন্তর থেকে কখনও মুছে যাবে? (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড: ৯, পৃষ্ঠা: ১৭৮)

হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে বনু উমাইয়ার ভালোবাসা ছিল বংশগত পক্ষান্তরে আহলে বাইতের মহব্বত ছিল আল্লাহর ওয়াস্তে

বনী-উমাইয়া উসমান (রা.)-এর ভালোবাসার দোহাই দিয়ে সাধারণ মুসলমানদেরকে তাদের দলভুক্ত করে। অথচ তাদের মধ্যে উসমান (রা.)-এর কোন আর্দশ ছিল না। প্রকৃত পক্ষে তারা অভিশপ্ত মারওয়ানের অনুসারী ছিল। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা 'আহলে বাইত'কে পাক পবিত্র করে নিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ নামক কোন ব্যাধি ছিল না। এর প্রমাণ পাওয়া যায়, কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার পরেও ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) উসমান (রা.)-কে আন্তরিক ভাবে ভালবাসতেন। কেউ তার নিন্দা করলে প্রতিবাদ করতেন। প্রমাণ স্বরূপ আবুল ফরজ ইবনে জাওযী (মৃত্যু-৫৯৭)-এর সীফাতুস সাফওয়াহ কিতাব থেকে একটি ঘটনা তুলে ধরছি।

আয-যুবাইর ইবনে বাক্কার বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে ইবরাহিম ইবনে কুদামাহ আল-লাখমী আমাদেরকে মুহাম্মদ ইবনে আলীর পিতা হতে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ইরাকের একটি সম্প্রদায়ের কিছুসংখ্যক লোক এক জায়গায় বসলেন এবং আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) ও উমর (রা.) সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাদের

সম্বন্ধে অনেক কথাই বলেন। তার পর তারা উসমান (রা.)-এর সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করেন। তখন হযরত আলী ইবনে হুসাইন (রা.) তাদেরকে বললেন, "আমাকে আপনারা সংবাদ দিন, আপনারা কি ঐসব প্রথমোক্ত মুহাজিরগণের অন্তর্ভুক্ত, যাদের কথা সূরায়ে হাশরের ৮নং আয়াতে আল্লাহ ইরশাদ করেন:

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

অনুবাদ: "যারা নিজেদের ঘর-বাড়ী ও সম্পত্তি হতে উৎখাত হয়েছে, তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্য করে। তারাই তো সত্যাশ্রয়ী।"(আল কোরআন) তারা বলল, 'না'। আলী বিন হুসাইন (রা.) বলেন, তাহলে তোমরা কি ঐসব ব্যক্তিদের অর্ন্তভূক্ত, যাদের কথা সূরায়ে হাশরের ৯নং আয়াতে বলা হয়েছে:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ

অনুবাদ: মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এ নগরীতে বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে তারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে। (আল কোরআন) তারা বলল, 'না'। তখন তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা স্বীকার করেছ এবং নিজেরাই সাক্ষ্য দিয়েছ যে, তোমরা এ সম্প্রদায়েরও অর্ন্তভূক্ত নও এবং ঐ সম্প্রদায়েরও অর্ন্তভূক্ত নও। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তোমরা ৩নং সম্প্রদায়ের অর্ন্তভুক্তও নও, যাদের সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা সূরায়ে হাশরের ১০নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন।

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا

অনুবাদ: "যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রনী আমাদের ভাইগণকে ক্ষমা কর এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না।"(আল কোরআন) কাজেই তোমরা আমার এখান থেকে উঠে যাও। আল্লাহ যেন তোমাদের মধ্যে বরকত দান না করেন। তোমাদের বাসস্থানকে যেন আল্লাহ পাক হেরেমের নিকটবর্তী না করেন। তোমরা ইসলাম সম্বন্ধে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করছ। তোমরা ইসলামের যোগ্য নও।(আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, খণ্ড: ৯, পৃষ্ঠা: ১৭৯, সীফাতুস সাফওয়াহ, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪৫)

আহলে বাইতকে সম্মান প্রদর্শন করার মাধ্যমে রাসূলে পাক (সা.)-এর সন্তুষ্টি অর্জন

হাফিয ইমাদ উদ্দিন ইবনে কাসীর (র.)-এর আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া কিতাব থেকে আহলে বাইতকে সম্মান প্রদর্শন করার মাধ্যমে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সন্তুষ্টি অর্জিত হয় এমন একটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

হযরত আনাস (রা.) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে বসেছিলেন। তাঁর চারপাশে সাহাবায়ে কিরাম (রা.) বসেছিলেন। এমন সময় হযরত আলী (রা.) সামনের দিক হতে আসলেন। তিনি এসে সকলকে সালাম দিলেন এবং দাঁড়িয়ে নিজের বসবার জন্য জায়গা খুঁজতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদের চেহারার দিকে তাকিয়ে রইলেন যে, কে তাকে বসবার জন্য জায়গা দেয়? হযরত আবু বকর (রা.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর ডান পাশে বসেছিলেন। তিনি নিজের জায়গা হতে সামান্য সরে বললেন, হে আবুল হাসান, এখানে আস। হযরত আলী (রা.) এগিয়ে এলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রা.)-এর মাঝখানে বসলেন। এতে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চেহারা মোবারকে খুশীর ভাব ফুটে উঠতে দেখলাম। তারপর তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-এর দিকে ফিরে বললেন, সম্মানী লোকদের মর্যাদা সম্মানী লোকেরাই বুঝতে পারে। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৫৩)

তিরমিযী শরীফে এসেছে: হযরত মুত্তালিব ইবনে রাবীআহ (রা.) বলেন, হযরত আব্বাস (রা.) খুব রাগান্বিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন কি হয়েছে? হযরত আব্বাস (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের বনু হাশিম ও কোরাইশদের কি হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন,তাদের সাথে আপনার কি হয়েছে? হযরত আব্বাস (রা.) বললেন, তারা যখন নিজেরা পরস্পর সাক্ষাৎ করে তখন তারা খুব হাসিমুখ থাকে আর যখন আমাদের সাথে সাক্ষাৎ হয় তখন তাদের চেহারা ভিন্ন রকম থাকে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এত রাগান্বিত হলেন যে, তাঁর দুই চক্ষুর মাঝের রগ ফুলে উঠল। তারপর যখন তাঁর রাগ কমলো তখন তিনি বললেন, সেই পাক যাতের কসম, যাঁর হাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রাণ রয়েছে, কারও অন্তরে ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান প্রবেশ করতে পারে না যতক্ষণ সে তোমাদেরকে (অর্থাৎ বনু হাশিমকে) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য মহব্বত করে। অতঃপর তিনি বললেন, তাদের কি হয়েছে যে, তারা আব্বাস (রা.)-এর ব্যাপারে আমাকে কষ্ট দেয়। মানুষের চাচা তার পিতার সমতুল্য হয়ে থাকে। (তিরমিযী)

আহলে বাইত ও তাদের সমর্থকদের প্রতি বনু উমাইয়ার হিংসা-বিদ্বেষ

এক বর্ণনায় এসেছে, হযরত হাসান (রা.) তাঁর জীবদ্দশায় হযরত আয়েশা (রা.)'র অনুমতি চেয়েছিলেন, যেন তাঁকে মৃত্যুর পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পাশে দাফন করা হয়। হযরত আয়েশা (রা.) অনুমতি দিয়েছিলেন। হযরত হাসান (রা.) ইন্তিকাল করলেন। তাঁকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পাশে দাফন করার উদ্যোগ নেয়া হল। কিন্তু উমাইয়া বংশের লোকজন তাতে বাঁধা দিল। হযরত হুসাইন (রা.) ওদের বাঁধা অতিক্রম করার জন্যে অস্ত্রে সজ্জিত হলেন। উমাইয়াগণও অস্ত্রে সজ্জিত হল। তারা বলল, আমরা হাসান (রা.) কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পাশে দাফন করতে দিব না। হযরত উসমান (রা.) কে দাফন করা হয়েছে জান্নাতুল বাকী'তে আর হাসান (রা.) কে দাফন করা হবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পাশে? তা হবে না। এ নিয়ে ঘোরতর সংঘর্ষের আশঙ্কা দেখা দিল। এ পরিস্থিতিতে হযরত সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা.) আবু হুরায়রা (রা.), জাবির (রা.) ও ইবনে উমর (রা.) প্রমুখ সংঘর্ষে না জড়াতে হযরত হুসাইন (রা.) কে পরার্মশ দিলেন। তিনি তাঁদের পরামর্শ মেনে নিলেন এবং হযরত হাসান (রা.)কে তাঁর মায়ের কবরের নিকট জান্নাতুল বকী'তে দাফন করলেন। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ৯৩)

বনু উমাইয়া সম্পর্কে রাসূলে পাক (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী

এ প্রসঙ্গে শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) ইযালাতুল খাফা কিতাব হতে কয়েকটি হাদিস উল্লেখ করা হলো -

১. ইমাম বায়হাকী ইবনে মুসাইয়্যাব (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্নে বনী উমাইয়াকে তাঁর মিম্বরের উপর দেখতে পেলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে ইহা অপছন্দনীয় মনে হলো। তখন তাঁর কাছে ওহী আসল যে, তাদেরকে কেবল দুনিয়া দেয়া হয়েছে। এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চক্ষু শীতল হলো।

২. ইমাম তিরমীযি, হাকিম ও বায়হাকী হাসান বিন আলী (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু উমাইয়াকে দেখলেন (স্বপ্নে) তারা একজন একজন করে তাঁর মিম্বরে অবস্থান করে খুতবা প্রদান করছে। এতে তিনি চিন্তিত হলেন। তখন সূরা কাওছার ও সূরা কদর অবর্তীণ হল। (ইযালাতুল খাফা, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৫১৮)

আহলে বাইত বিদ্বেষী হিশাম ইবনে আব্দুল মালিক

হিশামের শাসন কাল ছিল ১০৫ থেকে ১২৫ হিজরী পর্যন্ত। সে তার পূর্ব পুরুষের মত আহলে বাইত বিদ্বেষী ছিল. যা তার বিভিন্ন সময়কার কার্যকলাপ থেকে প্রমাণিত হয়। ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)-এর এক ছেলের নাম ছিল যায়েদ বিন আলী। যার সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা (র.) বলেছেন, আমি যায়েদ বিন আলীকে দেখেছি। তার থেকে অধিক ফকীহ আর কাউকে পাইনি। আমার যুগে তাঁর সমতুল্য আর কেউ নেই। (তারিখে ইসলাম)

ইমাম জাফর সাদিক (রা.) বলেন- আল্লাহর শপথ আমার চাচা সবচেয়ে বেশী কুরআন তিলাওয়াতকারী এবং ধর্ম বিষয়ক অধিক জ্ঞানী ছিলেন। তাঁর শাহাদাতের পর আমাদের গোত্রে তার মত কেউ নেই। (তারিখে ইসলাম পৃষ্ঠা: ২৩১)

যায়েদ (রা.) যখন কুফায় গেলেন, ৪০ হাজার লোক তাঁর হাতে বাই'আত গ্রহন করলেন। খিলাফতে রাশিদার অনুকরণে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য আবু হানিফা (র.) ও তার পক্ষে ফতওয়া প্রদান করেন; এমনকি তাঁকে আর্থিক সহযোগিতাও করেন। কুফার লোকেরা তার সাথে গাদ্দারী করলো। সুযোগ পেয়ে কুফার গভর্ণর ইউসুফ ইবনে উমর তাঁকে হত্যা করে হিশামের নিকট তাঁর মস্তক পাঠিয়ে দিলো।(ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। ইমাম যায়েদ (রা.)-এর সাথে হিশামের ব্যবহার অনেকটা ইয়াযিদের কাজের সাথে তুলনা করা যায়। (বিস্তারিত জানতে হলে মুফতি আমিমুল ইহসান (র.)-এর তারিখে ইসলাম দেখুন।)

হাফিয ইমাদ উদ্দিন ইবনে কাসির (র.)-এর আল-বিদায়া ওয়ান নেহায়া কিতাব থেকে হিশাম বিন আব্দুল মালিক সম্পর্কে কিছু আলোচনা তুলে ধরছি।

বিভিন্ন সনদে আস-সূলী এবং আল-জারীরী ও অন্যান্য অনেকে বর্ণনা করেছেন যে, হিশাম ইবনে আব্দুল মালিক তার পিতার খিলাফত আমলে এবং তার ভাই ওয়ালীদ'র খিলাফত আমলে হজ্জ করেছেন। একবার তিনি বায়তুল্লাহ তাওয়াফকালে হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করার ইচ্ছা করলেন কিন্তু, তিনি তা করতে পারলেন না। তাই তার জন্যে সেখানে একটি মিম্বর রাখা হলো। তিনি তার উপর বসলেন এবং হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করলেন। আর সিরিয়াবাসীরা তার কাছে দণ্ডায়মান ছিলেন। তার এ অবস্থার মাঝে দেখা গেল আলী ইবনুল হুসাইন (রা.) এগিয়ে এলেন। যখন তিনি হাজরে আসওয়াদকে চুমো খাওয়ার জন্য নিকটবর্তী হলেন তখন লোকজন তার সম্মানার্থে তার থেকে দূরে সরে যায়। তিনি সুন্দর চেহারার অধিকারী ছিলেন এবং একটি সুন্দর কাপড় পরিহিত ছিলেন। সিরিয়াবাসীরা হিশামকে বললেন, তিনি কে? হিশাম বলে, 'আমি তাকে চিনি না।' তার উদ্দেশ্য ছিল তাকে নগণ্য ও হীন বলে প্রকাশ করা যাতে সিরিয়াবাসীরা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে না পড়ে।

সে সময় আরবের তখনকার প্রখ্যাত কবি আল-ফারাযদাক হরম শরীফে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, আমি তাকে চিনি। তারা বললেন, তিনি কে ? তখন আল-ফারাযদাক নিম্নে বর্ণিত কবিতাগুলো আবৃত্তি করেন।

هذا الذي تَعرِفُ البَطْحاءُ وَطْأتَهُ   والبَيتُ يَعرِفُهُ والحِلُّ والحَرَمُ[1]

অর্থাৎ: তাকে পবিত্র মক্কার প্রশস্ত ভূমি ও কাদা মাটি চিনে। মহান আল্লাহর ঘর ও হরম শরীফের এলাকা এবং হরমের বাইরের এলাকাও তাঁকে চিনে।

هَـذَا ابْـنُ خَيْـرِ عِبـادِ اللهِ كُلِّهِـمُ   هَـذا التَّقِيُّ النَّقِيُّ الطَّاهِرُ العَلَـمُ

অর্থাৎ: তিনি মহান আল্লাহর সকল বান্দাদের মধ্যে সর্বোত্তম বান্দার সন্তান। তিনি পরহেযগার, পবিত্র, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও বিদ্বান।

إذَا رَأتْـهُ قُـرَيْـشٌ قـالَ قـائِلُهـا :   إلـى مَكـارِمِ هَـذَا يَنْتَهِـي الكَـرَمُ

অর্থাৎ: যখন কুরাইশরা তাঁকে দেখে, তখন তাদের মুখপাত্র বলে যে, এ ব্যক্তির মর্যাদা পর্যন্তই মর্যাদার শেষ প্রান্ত।

يَكـادُ يُمْسِكُـهُ عِـرْفـانُ رَاحَتِـهِ   رُكْـنُ الحَطِيـمِ إذا مَـا جـاءَ يَسْتَلِـمُ

অর্থাৎ: যখন তিনি রুকনে হাতিমকে স্পর্শ করতে আসেন, তখন হাজরে আসওয়াদ তার হাতকে আঁকড়ে ধরতে চায়। কেননা হাজরে আসওয়াদ তার হাতকে চিনে।

هـذا ابْنُ فـاطِمَـةٍ إنْ كُنْـتَ جـاهِلَهُ   بِجَـدِّهِ أنْبِيـاءُ اللهِ قَـدْ خُتِمُـوا

অর্থাৎ: যদি তুমি তাকে না চিন তাহলে জেনে রেখো তিনি ফাতিমার সন্তান এবং তার নানার কাছেই মহান আল্লাহর নবীগণের আগমন ধারার পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

مِنْ مَعْشَرٍ حُبُّهُمْ دِينٌ ، وبُغْضُهُمْ   كُفْرٌ ، وقُـرْبُهُـمْ مَنْجىً وَمُعْتَصَـمُ

অর্থাৎ: আর তিনি এমন এক সম্প্রদায়ের মহৎ ব্যক্তি যাদের সাথে মহব্বত রাখাই ধর্মের অংশ। যাদের হিংসা করাটা কুফরীর মধ্যে শামিল। আর তাদের নৈকট্য অর্জন নাজাত লাভের অসীলা ও আশ্রয়স্থল।

مُقَـدَّمٌ بَعْـدَ ذِكْـرِ اللهِ ذِكْـرُهُـمُ   فِي كُلِّ بَدْءٍ وَمَخْتُومٌ بِهِ الكَلِمُ[2]

অর্থাৎ: মহান আল্লাহর স্মরণের পর প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের স্মরনই সবকিছুর অগ্রে স্থান দেওয়া হয়। আর তাদের মহব্বত উল্লেখ সহকারে কথার সমাপ্তি ঘটানো হয়।

إنْ عُـدَّ أهْـلُ التُّقَـى كـانُـوا أئِمَّتَهُـمْ   أوْ قِيلَ: مَنْ خَيْرُ أهْلِ الأرْضِ قِيلَ: هُمُ

অর্থাৎ: যদি পরহেযগার লোকদের মানমর্যাদা সম্পর্কে হিসাব নেয়া হয়, তাহলে তারা ইমাম হিসেবে গণ্য হবেন। অথবা যদি বলা হয় ভূপৃষ্ঠের উত্তম ব্যক্তি কারা, তাহলে উত্তরে বলা হয় যে তারাই।

وَلَيْسَ قَوْلُكَ : مَنْ هذا ؟ بِضَائِرِهِ   الْعُرْبُ تَعْرِفُ مَنْ أَنْكَرْتَ وَالْعَجَمُ

অর্থাৎ: তাই তোমার কোন কথা বা মন্থব্যই তার অনিষ্ট করতে পারে না। যাকে তুমি চিনছো না তাকে আরব ও অনারব সকলেই চিনে।

مَنْ يَعْرِفِ اللهَ يَعْرِفْ أَوَّلِيَّةَ ذَا   فَالدِّينُ مِنْ بَيْتِ هذا نَالَهُ الأُمَمُ

অর্থাৎ: তাঁকে মহান আল্লাহ চিনেন এবং তার অগ্রাধিকারকেও মহান আল্লাহ চিনেন। এ পরিবার থেকেই অন্যান্য লোকেরা দ্বীন হাসিল করেছে।

বর্ণনাকারী বলেন, উপরোক্ত কবিতাগুলো শুনে হিশাম ভীষণ রাগান্বিত হলো এবং পবিত্র মক্কা-মদীনার মাঝামাঝি অবস্থিত উসফান নামক স্থানে ফারাযদককে বন্দী করার হুকুম দিল। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া খণ্ড: ৯, পৃষ্ঠা: ১৮১-১৮২)

উল্লেখ্য যে, উক্ত কবিতাটি বিদায়া নিহায়াসহ নির্ভরযোগ্য সকল সীরাতের কিতাবে বর্ণিত আছে। আবুল ফারায ইবনে জাওযী 'সিফাতুস সাফওয়াহ' কিতাবে উপরোক্ত ঘটনাসহ কবিতাগুলো উল্লেখ করেছেন।

ফারাযদাক এর পরিচিতি

হাফিয ইমাদ উদ্দিন ইবনে কাসীর (র.)-এর আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া কিতাব থেকে কবি ফারাযদাক সর্ম্পকে কিছু আলোচনা উল্লেখ করা হল-

তার নাম হুমাম ইবনে গালিব ইবনে সা'সা'আ ইবনে নাজিয়া ইবনে আক্কাল ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সুফিয়ান ইবনে মুজাশি ইবনে দারিম ইবনে হানযালা ইবনে যায়েদ ইবনে মানাত ইবনে মুরর ইবনে উদ্দ ইবনে তাবিখা, আবু ফিরাস ইবনে আবু খাতাল আত্-তায়মী আল-বাসরী। এই ব্যক্তি প্রসিদ্ধ কবি এবং ফারাযদাক নামে পরিচিত। তার পিতামহ সা'সা'আ ইবনে নাজিয়া হলেন সাহাবী। যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে প্রতিনিধি দলের সাথে আগমন করেন। তিনি জাহিলিয়াতের যুগে জীবন্ত প্রোথিত করার জন্য নির্ধারিত কন্যা সন্তানদের উদ্ধার করতেন। ফারাযদাক হযরত আলী (রা.) সর্ম্পকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তার পিতার সাথে হযরত আলী (রা.)-এর কাছে আসেন। হযরত আলী (রা.) প্রশ্ন করেন, এ কে? তার পিতা বলেন, এ আমার ছেলে, সে কাব্য চর্চা করে। এ কথা শুনে আলী (রা.) বলেন, তুমি তাকে কুরআন শিক্ষা দাও। কেননা, তা তার জন্য কাব্য চর্চার চেয়ে উত্তম। ফারাযদাক হযরত হুসাইন ইবনে আলী (রা.) থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন এবং ইরাক যাওয়ার পথে তার

সাক্ষাত লাভ করেছেন। এছাড়া তিনি হযরত আবূ হুরায়রা, আবূ সাঈদ খুদরী, আরফাযা ইবনে আসআদ, যুরারা ইবনে কুরাব, কবি তিরিম্মাহ ইবনে আদী থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। আর তার থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, খালিদ আল হাযয, মারওয়ান আসগর হাজ্জাজ ইবনে হাজ্জাজ আল আহওয়াল এবং আরো অনেক রাবী। তার চাচা হুবাবের মীরাসের দাবী নিয়ে তিনি হযরত মু'আবিয়া (রা.)'র দরবারে গমন করেন। এছাড়া তিনি খলিফাহ্ ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালিক এবং তার ভাইয়ের কাছে গমন করেন, তবে তা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয়। আশ'আস ইবনে আব্দুল্লাহ ফারাযদাক থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) আমার পায়ের দিকে তাকিয়ে বলেন, হে ফারাযদাক! আমি তোমার পা দুটি ক্ষুদ্র দেখছি। তুমি তাদের জন্য জান্নাতের একটু জায়গা খুঁজে নাও। আমি বলি, আমার পাপ তো অনেক। তিনি বলেন, কোন অসুবিধা নেই। আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, অস্তাচলে তাওবার জন্য সদা উন্মুক্ত একটি দরজা রয়েছে। তা ততদিন বন্ধ হবে না, যতদিন না পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হবে। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড: ৯, পৃষ্ঠা: ৪২৪-৪২৫)

রাসূলে পাক (সা.)-এর দু'আয় হযরত মু'আবিয়া (রা.)-এর দু'টি উপকার হয়েছে

ইমাম আহমদ, ইমাম মুসলিম এবং হাকিম তাঁর 'মুসতাদরাক' গ্রন্থে আবূ আওয়ান আল ওয়াযাযাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইয়াশকুরীর সূত্রে তিনি আবূ হামযা ইমরান ইবনে আবূ আতা থেকে তিনি হযত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, একবার আমি বালকদের সাথে খেলছিলাম। হঠাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে উপস্থিত হলেন। আমি ভাবলাম নিশ্চয় তিনি আমার কাছে এসেছেন। তখন আমি একটি দরজার আড়ালে আত্মগোপন করলাম। তিনি আমার কাছে এসে আমাকে একটি বা দু'টি মৃদু ধাক্কা দিলেন। তারপর বললেন, যাও, আমার কথা বলে মু'আবিয়াকে ডেকে আন। উল্লেখ্য যে, তিনি ওহী লিখক ছিলেন। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, তখন আমি গিয়ে তাঁকে ডাকলাম। তখন আমাকে বলা হল, তিনি খাচ্ছেন। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে বললাম, তিনি খাচ্ছেন। এ কথা শুনে তিনি বললেন, আবার যাও, তাঁকে ডেকে আন। আমি দ্বিতীয় বার তাঁকে ডাকতে আসলাম। এবারও আমাকে বলা হল, তিনি খাচ্ছেন। তখন গিয়ে তাঁকে অবহিত করলাম। তৃতীয় বার তিনি বলেন, আল্লাহ তাঁকে তৃপ্ত না করুন।

রাবী বলেন, এরপর আর কখনও তিনি তৃপ্ত হননি। মু'আবিয়া (রা.) এই দু'আ দ্বারা দুনিয়া ও আখিরাতে উপকৃত হয়েছেন। দুনিয়ার উপকার হল, তিনি যখন শামের গর্ভনর হন, তখন দিনে সাতবার আহার গ্রহণ করতেন, প্রচুর পরিমাণ গোশতপূর্ণ পাত্র পেঁয়াজসহ তাঁর কাছে আনা হত এবং তিনি তা (যথেষ্ট পরিমাণ) খেতেন। দিনের মধ্যে সাতবারই তিনি গোশত সহযোগে খেতেন। এছাড়া প্রচুর পরিমাণ মিষ্টান্ন দ্রব্য এবং ফলমূল খেতে পারতেন এবং বলতেন, আল্লাহর কসম! (এতে) আমি তৃপ্ত হই না, ক্লান্ত হয়ে পড়ি। আর পাকস্থলী এমন এক নি'আমত যার আকাঙ্খা সকল রাজা বাদশাহ করে থাকে। আর আখিরাতের উপকারের বিষয়টি হল ইমাম মুসলিম এই হাদীসের পর আরেকটি হাদীস উল্লেখ করেছেন যা ইমাম বুখারী এবং অন্যান্য মুহাদ্দিস একাধিক সাহাবী থেকে একাধিক সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- হে আল্লাহ! আমি তো একজন মানুষ। তাই আপনার যে বান্দাকেই আমি কটু কথা বলেছি কিংবা আঘাত করেছি কিংবা বদ-দু'আ করেছি অথচ সে তার উপযুক্ত নয়, তার জন্য আপনি তাকে পাপমোচনকারী এবং কিয়ামতের দিন আমার নৈকট্যের মাধ্যম করুন। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ২৩২)

হযরত মু'আবিয়া (রা.) ও হযরত ওয়াইল ইবনে হুজুর (রা.) এর ঘটনা

হযরত ওয়াইল ইবনে হুজুর (রা.) বলেন, যখন আমাদের নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মদীনায় হিজরতের সংবাদ পৌছল তখন আমি আমার কওমের প্রতিনিধি হয়ে চললাম এবং মদীনায় এসে পৌছলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাতের পূর্বে তাঁর সাহাবীদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হল। তারা বললেন, তোমার আসার তিনদিন পূর্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে তোমার আগমণের সুসংবাদ দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, তোমাদের নিকট ওয়াইল ইবনে হুজুর আসছেন। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে তিনি আমাকে স্বাগত জানালেন এবং আমাকে নিজের নিকটে জায়গা দিলেন, নিজের চাদর মুবারক বিছিয়ে তার উপর আমাকে বসালেন। তারপর লোকদেরকে ডাকলেন। লোকজন একত্রিত হলে তিনি মিম্বরে উঠলেন এবং আমাকে নিজের সাথে মিম্বারের উপর উঠালেন। আমি তাঁর নীচে বসলাম। তিনি আল্লাহ তা'আলার হামদ ও সানা পাঠ করে বললেন, 'হে লোকসকল, ইনি ওয়াইল ইবনে হুজুর। অনেক দূরের এলাকা হাদরামাউত থেকে তোমাদের নিকট এসেছেন। স্বেচ্ছায়

এসেছেন, কেউ তাকে বাধ্য করেনি। আর সে সেখানকার শাহজাদাদের মধ্য হতে সর্বশেষ ব্যক্তি। হে ওয়াইল ইবন হুজুর! আল্লাহ তা'আলা তোমার মধ্যে ও তোমার আওলাদের মধ্যে বরকত দান করুন। ....

হাদীসের বাকী অংশ উল্লেখ করার পর বলেন- তারপর যখন হযরত মু'আবিয়া (রা.) বাদশাহ হলেন, তখন তিনি কুরাইশের বুসর ইবনে আরতাতা (রা.) নামক এক ব্যক্তিকে পাঠালেন এবং তাকে বললেন, আমি এই কোণকে তো (আমার সাথে) মিলিয়ে নিয়েছি (অর্থাৎ এই দিকের লোকেরা তো বশ্যতা স্বীকার করে আমার নিকট বাই'আত হয়ে গেছে)। তুমি তোমার বাহিনী নিয়ে যাও। যখন তুমি সিরিয়ার সীমানা পার হয়ে সামনে অগ্রসর হবে তখন নিজের তরবারী কোষমুক্ত করে নেবে এবং যে কেউ আমার বাই'আত অস্বীকার করবে তাকে হত্যা করবে। এভাবে তুমি মদীনায় পৌছবে এবং মদীনাবাসী যে কেউ আমার বাই'আতকে অস্বীকার করে তাকে হত্যা করবে। আর তুমি যদি হযরত ওয়াইল ইবনে হুজুর (রা.) কে জীবিত পাও তবে তাঁকে আমার নিকট নিয়ে আসবে। হযরত বুসর (রা.) আদেশ অনুযায়ী কাজ করলেন এবং হযরত ওয়াইল (রা.) কে জীবিত পেয়ে তাকে হযরত মু'আবিয়া (রা.) এর নিকট নিয়ে এলেন। হযরত মু'আবিয়া (রা.) তাকে যথাযথ স্বাগত জানাবার ও এগিয়ে আনার হুকুম দিলেন, তাঁর দরবারে প্রবেশের অনুমতি দিলেন এবং নিজের সাথে সিংহাসনে বসালেন। তারপর হযরত মু'আবিয়া (রা.) তাঁকে বললেন, আমার এই সিংহাসন উত্তম, না তোমার সেই উটের পিঠ উত্তম? হযরত ওয়াইল (রা.) বলেন, আমি বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন, আমি তখন কুফর ছেড়ে ইসলামে নতুন প্রবেশ করেছিলাম, জাহিলিয়াতের স্বভাব তখনও পরিত্যাগ করিনি। উটের পিঠে বসাতে ও জুতা দিতে অস্বীকার করা সেই জাহিলিয়াতেরই স্বভাব ছিল। অত:পর আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ইসলামের তৌফিক দিয়েছেন, আর ইসলাম আমার সেই সমস্ত কার্যকলাপকে ঢেকে দিয়েছে।

মু'আবিয়া (রা.) বললেন, আমাদের সাহায্য করতে আপনার কিসের বাঁধা? অথচ হযরত উসমান (রা.) আপনার উপর আস্থা রাখতেন এবং আপনাকে নিজের জামাতা বানিয়েছিলেন। আমি বললাম, (আমি এ জন্য আপনার সাহায্য করতে পারি না) যেহেতু আপনি এমন ব্যক্তির সাথে যুদ্ধ করেছেন, যিনি হযরত উসমান (রা.) এর ব্যাপারে আপনার তুলনায় অধিক হক রাখেন। মু'আবিয়া (রা.) বললেন, তিনি আমার চেয়ে বেশী হকদার কিরূপে হলেন? অথচ বংশের দিক দিয়ে তো আমি হযরত উসমান (রা.) এর বেশী নিকটবর্তী। আমি বললাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী ও হযরত উসমান (রা.) এর মধ্যে ভাইয়ের সম্পর্ক কায়েম করে দিয়েছিলেন। (আর আপনি তার চাচাত ভাই)

অতএব, ভাই চাচাত ভাই অপেক্ষা অধিক হক রাখে। দ্বিতীয় কথা হল, আমি মুহাজিরদের বিরুদ্ধাচরন করতে চাই না। মু'আবিয়া (রা.) বললেন, আমরা কি মুহাজির নই? আমি বললাম, অবশ্যই, কিন্তু আমরা কি উভয় দল হতে পৃথক রইনি? আরো এক দলীল এই যে, একবার আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম এবং আরো বহু লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্বদিকে মাথা উঠিয়ে সেইদিকে দৃষ্টিপাত করলেন। তারপর বললেন, অন্ধকার কালো রাত্রির টুকরোর ন্যায় তোমাদের উপর বহু ফিতনা আসবে। সেই সকল ফিতনা অত্যন্ত কঠিন ও দ্রুত আসবে এবং অত্যন্ত খারাপ হবে বলে তিনি উল্লেখ করলেন। উপস্থিত লোকদের মধ্যে আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! সেই সকল ফিতনা কি? তিনি বললেন, হে ওয়াইল! যখন মুসলমানদের মধ্যে দুই তরবারী চলবে (অর্থাৎ মুসলমানদের দুই দল পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হবে) তখন তুমি উভয় দল হতে পৃথক থাকবে।

হযরত মু'আবিয়া (রা.) বললেন, আপনি কি শিয়া হয়ে গেছেন? (অর্থাৎ হযরত আলী (রা.) এর পক্ষ অবলম্বনকারী হয়ে গেছেন?) আমি বললাম, না। আমি তো সমস্ত মুসলমানদের কল্যাণ চাই। হযরত মু'আবিয়া (রা.) বললেন, আমি যদি এই সমস্ত কথা পূর্বে শুনতাম ও জানতাম তবে আপনাকে এখানে ডেকে আনতাম না। আমি বললাম, হযরত উসমান (রা.) এর শাহাদাতের সময় হযরত মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা.) কি করেছিলেন, তা কি আপনার জানা নেই? তিনি পাথরের উপর তরবারী মেরে তা ভেঙ্গে ফেলেছিলেন। হযরত মু'আবিয়া (রা.) বললেন, এ আনসারদের কওম এমনই যে, তাদের এই সমস্ত বিষয় সহ্য করতে হয়। আমি বললাম, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ হাদীসের কি করব? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আনসারদেরকে মহব্বত করেছে সে আমার মহব্বতের কারণে তাদেরকে মহব্বত করেছে, আর যে ব্যক্তি আনসারদের সাথে শত্রুতা পোষণ করেছে সে আমার সাথে শত্রুতা পোষণের কারনে তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করেছে। (হায়াতুস সাহাবা, লেখক ইউসুফ কান্দলবী, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৮১৭,৮১৯), মাজমাউয যাওয়াইদ, খণ্ড: ৯, পৃষ্ঠা: ৩৭৬-৩৭৯)

নোট: তাবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইলিয়াস সাহেবের ছাহেবজাদা মাওলানা ইউসূফ কান্দলবী সাহেব তাবলীগ জামাতের চূড়ান্ত নেসাব 'হায়তুস সাহাবা' কিতাবে 'মুসলমানদেরকে হত্যা করা থেকে বাঁচা ও রাজত্বের জন্য লড়াই করাকে অপছন্দ করা" অধ্যায়ে উপরোক্ত আলোচনা এনেছেন।

লক্ষনীয় যে, হযরত ওয়াইল বিন হুজুর (রা.) আল্লাহর রাসূলের বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জন্য বরকতের দু'আ করেছেন। তিনি সিফফিনের যুদ্ধে হযরত আলী (রা.) এর পক্ষে যুদ্ধ করেছেন। হযরত মুআবিয়া (রা.) হয়তো হযরত ওয়াইল (রা.) কে উদ্দেশ্য করে 'আপনি কি শিয়া হয়ে গেছেন?' বলে একথা বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, হযরত ওয়াইল (রা.) হযরত আলী (রা.) এর পক্ষ অবলম্বন করেছেন। কিন্তু বর্তমানে ওয়াহাবীরা আহলে বাইতের পক্ষে কেউ কথা বললেই তাদেরকে শিয়া অপবাদ দিয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, এ ধরনের অপবাদ মহান ইমামদের ব্যাপরও ঘটেছে। যেমন- তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, সূরা শুরা, আয়াত ২৩ এর তাফসীরে ইমাম শাফিঈ (র.)'র একটি কবিতা উল্লেখ করেছেন। নিম্নে কবিতাটি উল্লেখ করা হল।

ان كان رفضا حب ال محمد ☆ فليشهد الثقلان اني رافضي (امام شافعي)

অনুবাদ: যদি আহলে বাইতকে মুহাব্বত করার কারণে কেউ রাফিযী হয়ে যায় তবে সকল জিন ও ইনসান যেন জেনে রাখে যে, আমি রাফিযী।

হযরত মু'আবিয়া (রা.) সম্পর্কিত উপরোল্লেখিত ঘটনাবলির জন্য আমরা তার সমালোচনা করতে পারব না। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামের সমালোচনা করাকে নিষিদ্ধ করেছেন। আমরা তার সম্পর্কে কেবল একথাই বলব, যা সিরাজুল হিন্দ শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলভী (র:) ফতওয়ায়ে আযিযী গ্রন্থে বলেছেন। তিনি লেখেন-

বিশেষত: মু'আবিয়া (রা.) যেহেতু সাহাবী ছিলেন, তিনি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শাফা'আত লাভের অধিক আশা রাখেন। আর এটাও অধিক আশা করা যায় যে, যার দাবী অর্থাৎ হযরত আলী (রা.) নিজের হক মাফ করে দেবেন। (ফতওয়ায়ে আযিযী, পৃষ্ঠা: ২৫১)

উল্লেখ্য আমির মু'আবিয়া (রা.) কোন কোন সময় আলী (রা.)-এর ফযিলতের আলোচনা শুনতেন, তখন তার সম্মুখে সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। প্রমাণ স্বরূপ একটি ঘটনা নিম্নে উল্লেখ করছি।

হামদানের এক লোক থেকে আবু উমর বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, হযরত মু'আবিয়া যাররার সুদ্দীক বললেন, হে যাররার! হযরত আলী (রা.)-এর কি কি গুণ ছিল তা শুনাও। তিনি বললেন, যদি শুনতেই চান, তাহলে বলছি। তাঁর গুণাবলীর বর্ণনা শেষ করা সুকঠিন। তিনি শক্তিধর ব্যক্তি ছিলেন, সিদ্ধান্তমূলক কথা বলতেন। ইনসাফের সাথে হুকুম দিতেন। তাঁর চারদিকে যেন ইলমের নহর উছলে পড়ত ও তাঁর সব দিকেই হিকমতের ফোঁটা টপকে পড়ত। দুনিয়া ও তার চাকচিক্যকে তিনি ভয় পেতেন। রাত ও তার নির্জনতা তাঁর প্রিয় ছিল। অত্যধিক অশ্রুপাত করতেন। আল্লাহর সত্ত্বা ও গুণাবলীর চিন্তায় বিভোর ও ধ্যানমগ্ন

থাকতেন। তিনি ছোট খাটো পোশাক পছন্দ করতেন এবং সাধারণ খাবার খেতেন। আমাদের সাথে সাধারণ সাথীদের মতই বসতেন। যখনই আমরা কোন প্রশ্ন করতাম, সাথে সাথে তিনি জবাব দিতেন। আমরা তাঁকে অপেক্ষা করতে বললে তিনি আমাদের জন্যে অপেক্ষা করতেন। আল্লাহর কসম! তিনি আমাদের নৈকট্য দান করতেন, আমরাও তাঁর নৈকট্য পেয়ে ধন্য ছিলাম, তথাপি তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্বের কারণে আমরা তাঁর সাথে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে সাহস পেতাম না। তিনি দ্বীনদার লোকদের মর্যাদা দিতেন ও দরিদ্রদের কাছে ডেকে বসাতেন। যত ক্ষমতাবান লোকই হোক তাঁর কাছ থেকে সে অন্যায় সহায়তার আশা করতে পারত না। তাঁর ইনসাফ থেকে দুর্বলরা নিরাশ হত না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, যখন রাতের আঁধার ছেয়ে যেত ও তারকারাজি অন্তর্হিত হত, তখন তাঁকে তাঁর ইবাদতের জায়গায় আমি নিজে দেখতে পেয়েছি যে, তিনি নিজ দাড়ি ধরে সাপে কাটা লোকের মত লুটোপুটি খেতেন এবং এই বলে কাঁদতেন, হে দুনিয়া! তুই অন্যকে গিয়ে ধোঁকা দে। তুই কি আমার জন্যে পাগল যে, আমার সামনে নিজেকে পেশ করছিস? দূর হ! দূর হ! আমি তোকে তিন তালাক দিয়েছি। এখন আর তোকে ফিরিয়ে নেয়ার কোন পথ নেই। তোর আয়ু ক্ষণস্থায়ী। তোর মর্যাদাও নগণ্য। হায়, পাথেয় সামান্য, অথচ দূরের সফর। পরন্তু পথ ভয়সংকুল। এ বর্ণনা শুনে আমীর মু'আবিয়া কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর বললেন, আল্লাহ পাক আবুল হাসানের (রা.) ওপর রহম করুন। আল্লাহর কসম! তিনি এ ধরনের লোকই ছিলেন। তারপর হযরত মু'আবিয়া (রা.) প্রশ্ন করলেন, হে যাররার! তুমি তাঁর জন্যে কতখানি দুঃখিত? তিনি বললেন, যে মায়ের একমাত্র ছেলেকে তার কোলে রেখে যবেহ করা হয়, সেই মায়ের মতই দুঃখিত। (ইযালাতুল খাফা, সিফাতুস সাফওয়াহ, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১২২)

নোটঃ হযরত মু'আবিয়া (রা.) ছিলেন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবী। সাহাবীদের সমালোচনা করা অবৈধ, কারণ তাঁরা সকলেই বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত। তবে হযরত আলী (রা.) এর সাথে হযরত মু'আবিয়া (রা.)-এর সংঘটিত বিষয়সমূহে যে হযরত মু'আবিয়া (রা.)-এর ইজতিহাদ সঠিক ছিল, তা বলা যাবে না।

উলামায়ে মা ওরাউন নাহর, মুফাসিরীন ও ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, হযরত আলী (রা.) এর সাথে হযরত মুআবিয়া (রা.)- এর যুদ্ধ-বিগ্রহ কেবল ইজতেহাদী ভুল ছিল। মুহাক্কিক হাদীস বিশেষজ্ঞগন অনুসন্ধান করে দেখেছেন যে, এসকল কর্মকান্ডে তিনি প্রবৃত্তির প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন না। .... যার শেষ কথা হলো তাঁর এ কাজকে অন্যায়ভাবে সত্যিকার খলীফার বিরোদ্ধে বিদ্রোহ বলা যায়। ('ফতওয়ায়ে আযিযি', পৃষ্ঠা: ২৫১)

এ প্রসঙ্গে শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর 'ফতওয়ায়ে আযিযি'র ভাষ্য নিম্নরূপ-

علماء اورا از انبہر ...

وفقہاء این ہمہ حرکات وجنگ وجدل او را کہ با جناب مرتضی علی نمود محمول بر خطائے اجتہادی دانند

ومحققین اہل حدیث بعد تتبع روایات صحیح دریافتہ اند کہ این حرکات او خالی از شائبہ نفسانی نبود

وخالی از تہمت تعصب امویہ وقرشیہ کہ بجناب ذی النورین داشت نبودہ است پس نہایت کار آن

است کہ مرتکب کبیرہ وباغی باشد وایذا مستحق لعن باہل اللعن

মজলুম সাহাবী হযরত হুজুর ইবনে আদী (রা.)-এর শাহাদাত

হযরত হুজর ইবনে আদী (রা.) ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শীর্ষস্থানীয় সাহাবী। তিনি আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.)-এর মতো সিফফিনের যুদ্ধে আলী (রা.)-এর পক্ষে ছিলেন। অতঃপর যখন ইমাম হাসান (রা.) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহন থেকে অব্যাহতি নিলেন তখন তিনি মু'আবিয়া (রা.)-এর হাতে বাই'আত গ্রহন করেন। তার শাহাদাতের পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ত মু'আবিয়া (রা.)-এর বাই'আত ভঙ্গ করেননি। যিয়াদ বিন সুমাইয়ার ষড়যন্ত্রে হযরত মু'আবিয়া (রা.) তাঁকে হত্যা করেন।

হযরত হুজুর ইবনে আদীকে (রা.) নির্মমভাবে শহীদ করা হয়। তার এ শাহাদাতে উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের যে প্রতিক্রিয়া ছিলো তা থেকে বুঝা যায় যে তিনি অন্যায়ের বিপক্ষে প্রতিবাদ করে জুলুমের স্বীকার হয়েছেন। ইমাম ইবনে আব্দুল বার (মৃত্যু: ৪৬৩ হিজরী)-এর 'আল ইস্তি'আব ফি আসমাইল আসহাব' কিতাবে যে বর্ণনা উপস্থাপন করেন তা থেকে বুঝা যায় তিনি শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত মু'য়াবিয়া (রা.)-এর বাইআত ভঙ্গ করেননি। তিনি বলেন- হুজুর (রা.) বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন, যদিও বয়সের দিক থেকে প্রবীন সাহাবীদের তুলনায় কম বয়সী ছিলেন।...... যখন হযরত মু'আবিয়া (রা.) যিয়াদকে ইরাক ও পার্শবর্তী এলাকার শাসক নিয়োগ করেন। শাষক হয়ে সে তার অত্যাচারী ও দুশ্চরিত্র মানসিকতার প্রকাশ ঘটায়। তখন হযরত হুজুর (রা.) তার বাইআত ভঙ্গ করেন। কিন্তু মু'য়াবিয়া (রা.)-এর বাইআত ভঙ্গ করেননি। আলী (রা.)-এর একদল সমর্থক যারা আলী (রা.)কে ভালোবাসেন তারা তাকে সঙ্গ দেন । তিনি ও তাঁর সমর্থকগণ একদিন যিয়াদকে কংকর

নিক্ষেপ করেন। (কারন সে নামাযে এতই বিলম্ব করছিলো যে নামাযের ওয়াক্ত চলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল।) যিয়াদ মু'য়াবিয়া (রা.)-এর কাছে এ প্রসঙ্গে পত্র প্রেরণ করে। মু'য়াবিয়া (রা.) হযরত হুজুর বিন আদী (রা.)কে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। সে হুজুর ইবনে আদী (রা.) সহ বারোজনকে ওয়াইল বিন হুজুর আল খাদরামীর মাধ্যমে মু'য়াবিয়া (রা.)-এর কাছে প্রেরণ করে। সকলেই লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিলেন। মু'য়াবিয়া (রা.) ছয়জনকে হত্যা করেন আর অপর ছয়জনকে মুক্তি দেন। যারা শহীদ হন তাদের মধ্যে হুজুর (রা.) একজন ছিলেন। যিয়াদের কর্মের খবর হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর কাছে পৌছলো। তিনি আব্দুর রহমান ইবনে হারিস ইবনে হিশামকে মু'য়াবিয়া (রা.)-এর কাছে পাঠান এ সংবাদ দিয়ে 'হুজুর ইবনে আদীর (রা.) ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। আব্দুর রহমান ইবনে হারিস ইবনে হিশাম সেখানে পৌছে হুজুর ইবনে আদী (রা.) ও তার পাঁচজন সাথীর শাহাদাতের সংবাদ পান। (আল ইস্তি'আব, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১৯৭-১৯৮)

হযরত হুজুর ইবনে আদী (রা.)-এর মত একজন সাহাবী যিয়াদের মত একজন দুশ্চরিত্র গভর্ণরকে কিভাবে সমর্থন করতে পারেন? যেখানে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যৎবাণী করেছেন, নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো।

হযরত আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মানুষের জন্য এমন একটি সময় আসবে, যখন তাদের আমীরগণ হবেন নির্বোধ। মন্দ লোকদেরকে তারা প্রাধান্য দিবে, উত্তম লোকদেরকে অবজ্ঞা করবে এবং ওয়াক্ত মত নামায পড়বে না। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তাদের পাও, তোমরা তাদের সঙ্গ দিবে না, তাদের সৈন্য হবে না, তাদের ট্যাক্স আদায়কারী হবে না এবং তাদের কোষাধক্ষ্যও হবে না। ইমাম হায়সামী উক্ত হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (মাজমাউয যাওয়াইদ, খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ২৪৩)

উল্লেখ্য: কেন কোন আহলে বাইতবিদ্বেষী বলে থাকেন, এ ধরণের শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন। তাহলে হযরত হুজুর (রা.) এমনটি কেন করলেন? এর উত্তরে বলা যায়, প্রতিবাদ করার কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বিশেষ করে নামাযের ব্যাপারে প্রতিবাদে সীমিত না থেকে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার নির্দেশ দিয়েছেন।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের উপর এমন শাসক নিযুক্ত করা হবে, তোমরা তাদের কিছু কার্যকলাপ (ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী হওয়ার কারণে) পছন্দ করবে আর কিছু কার্যকলাপ (শরীয়ত বিরোধী হওয়ার কারণে) অপছন্দ করবে। এমন অবস্থায় যে ব্যক্তি শাসকবর্গের গর্হিত কর্মকাণ্ডকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করবে, সে আল্লাহর কাছে দায়মুক্ত থাকবে। আর যে ব্যক্তি এর প্রতিবাদ করবে সে নিরাপদ। কিন্তু যে ব্যক্তি তাদের এরূপ কাজের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করবে এবং তার অনুসরণ করবে (তারা দায়মুক্ত নয়)। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা কি তাদের (এরূপ স্বৈরাচারী শাসকদের) বিপক্ষে লড়াই করব না? তিনি বললেন: না, যে পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে নামায প্রতিষ্ঠিত রাখবে, ততক্ষণ পর্যন্ত (তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে) না। (মুসলিম : ১৮৫৪)

দেরিতে নামায আদায়কারীদের জন্য ওয়াইল দূযখ

হযরত সা'দ বিন ওয়াক্কাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম এরা কারা? জবাবে তিনি বললেন, এরা ঐ সমস্ত লোক যারা দেরী করে নামায আদায় করে। (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩৩০)

দেরিতে নামায আদায় করা ধ্বংসের কারণ

হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.) মানুষকে তা'লিম দিতে গিয়ে বলতেন, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁর সাথে কাউকে শরীক কর না। নামায সময় মত আদায় কর যে সময়ে আদায়ের জন্য আল্লাহ পাক নির্ধারণ করে দিয়েছেন। দেরী করে নামায আদায়ের মধ্যে ধ্বংস নিহিত রয়েছে। (ইবনে আবী শায়বাহ, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩১৬)

দেরীতে নামায আদায় করা প্রসঙ্গে দেওবন্দী প্রখ্যাত আলিম মুফতি ইরশাদ আহমদ কাসিমী তাঁর 'শামাইলে কুবরা' কিতাবে লেখেন-

হযরত আবু যর গেফারী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, সেই সময় তোমাদের অবস্থা কেমন হবে যখন বাদশাহগণ নামাযের প্রাণ বের করে ফেলবেন কিংবা দেরী করে নামায আদায় করবেন? হযরত আবু যর (রা.) বললেন, আপনি কি নির্দেশ দেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন, সঠিক সময়ে নামায আদায় করে নাও। এর পর যদি তার (শাষকের) সাথে পড়তে হয় তাহলে আবার পড়ে নাও। এটা তোমার জন্য নফল হবে। (আবু দাউদ, পৃষ্ঠাঃ ৬২, মুসলিম, পৃষ্ঠাঃ ২৩০)
ফায়দাঃ রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ভবিষ্যতবাণী বনু উমাইয়ার যুগে বাস্তবায়িত হয়। ওয়ালিদ, হাজ্জাজ প্রমূখ দীর্ঘ খুতবাহ দিত এবং নামাযকে মুস্তাহাব ওয়াক্ত পেরিয়ে যাওয়ার পর আদায় করত। (শামাঈলে কুবরা, খণ্ডঃ ৬, পৃষ্ঠাঃ ৩৬৯)

বনু উমাইয়ার কাছে কি আমীরের নির্দেশের গুরুত্ব আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের নির্দেশের গুরুত্বের চেয়ে বেশী?

হযরত আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, ওয়ালিদ বিন উকবাহ একদিন নামাযে দেরী করল। (অর্থাৎ সে ভাষন দিচ্ছিল এমতাবস্থায় নামাযের মুস্তাহাব ওয়াক্ত চলে গিয়ে মাকরূহ ওয়াক্ত হয়ে গিয়েছিল।) হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) ইকামত দিয়ে নামায শুরু করে দিলেন। লোকেরাও তাঁর সাথে নামায পড়তে লাগলেন। ওয়ালিদ বলল, তোমাকে এ কাজ করতে কিসে উৎসাহ দিল? আমীরুল মু'মিনীন-এর কাছ থেকে কি কোন সংবাদ এসেছে না কি তুমি নিজেই কোন বিদআত আবিস্কার করেছো? ইবনে মাসউদ (রা.) জবাব দিলেন, আমীরুল মু'মিনীন-এর কাছ থেকে কোন সংবাদ আসেনি এবং আমিও কোন বিদআত আবিস্কার করিনি। বরং আল্লাহ ও রাসূল নিষেধ করেছেন যে নামাযের ক্ষেত্রে আমরা তোমাদের অপেক্ষা করব আর তোমরা তোমাদের কাজে ব্যস্ত থাকবে। (অর্থাৎ তোমাদের সাথে আমরাও নামাযে দেরী না করে সঠিক সময়ে নামায আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন।) (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, খণ্ডঃ ১ পৃষ্ঠাঃ ৩২৯)

মুফতিয়ে হিন্দ সৈয়দ আমীমুল ইহসান (র.) এর 'তারীখে ইসলাম' কিতাব থেকে হযরত হুজর বিন আদী (রা.)-এর শাহাদতের কিছু আলোচনা তুলে ধরা হল

হযরত হুজুর বিন আদী (রা.) ছিলেন খুবই মুত্তাকী ও দুনিয়াত্যাগী সাহাবী। মুসতাদরাকে হাকিমে তাঁকে রাহিবে আসহাবে নবী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁকে 'হুজরুল খাইর' (সকল উত্তমতার কেন্দ্র) বলা হত। হযরত আম্মার (রা.)-এর মত তিনি সব সময় হযরত আলী (রা.) এর সাথে থাকতেন। হযরত হাসান (রা.) যখন হুকুমত হযরত মু'আবিয়া (রা.) এর হাতে সমর্পন করেন, তখন তিনিও হযরত মু'আবিয়া (রা.) এর হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। আমীরে মু'আবিয়া (রা.) ও তাঁর রাজত্বের আমিরগণের প্রথা হয়ে গিয়েছিল যে, মিম্বরে

দাঁড়িয়ে সাইয়্যিদুনা হযরত আলী (রা.)-কে দোষারোপ ও গালাগালি করা। কুফার গভর্নর হযরত মুগীরাহ (রা.) ছিলেন উত্তম বুযুর্গ, কিন্তু মুআবিয়া (রা.) এর অনুসরন করতে গিয়ে তিনিও এ কাজ থেকে বাঁচতে পারেননি। অন্যান্য বয়স্ক সাহাবীদের মত হযরত হুজুর বিন আদীও (রা.) এ কাজকে অপছন্দ করতেন। অনেকবার হযরত মুগীরা (রা.)-কে তিনি ও আশারায়ে মুবাশ্বারার অন্যতম সাহাবী হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.) এ কাজ করতে নিষেধ করেন। কিন্তু এ দিকে রাজনৈতিক অক্ষমতা ছিল, যদিও তিনি নিজেও এটাকে ভালো মনে করতেন না। যখন গালি-গালাজের ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়নি, তখন হযরত হুজুর (রা.) হযরত মুগীরা ও মু'আবিয়া (রা.) কে পাল্টা গালাগালি করে নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করেন। কিন্তু হযরত মুগীরা (রা.) তাঁকে বাধা দেননি বরং তাঁর সাথে ভালো ব্যবহার করে খুশী রাখার চেষ্টা করতেন। হযরত মুগীরা (রা.)-এর ইন্তিকালের পর যিয়াদ কুফার সাথে বসরারও গভর্নর হয়ে এলো। একদিন সে জুমআর খুতবায় এক অস্বাভাবিক ভাষন দিল যাতে অধিকাংশই গালি-গালাজ ছিল। হযরত হুজুর (রা.) বললেন, নামায শুরু কর। কিন্তু সে মানল না। হযরত হুজুর (রা.) তার দিকে কংকর ছুঁড়ে মারলেন। এর পর সে নেমে আসল এবং নামায আদায় করল। অতঃপর সে মু'আবিয়া (রা.)-কে চিঠি লেখে তা জানাল, কারণ হুজর (রা.) এর সাথে দুর্ব্যবহার করা তার ক্ষমতার বাইরে ছিল। হুজুর (রা.) এর সাথে মুগীরা (রা.)-এর মতবিরোধের কথা আগেই মু'আবিয়া (রা.) এর কাছে পৌছেছিল। শামের দরবার থেকে আদেশ আসল, হুজুর (রা.) ও তার সঙ্গীদেরকে দামেশক পাঠিয়ে দাও। হযরত হুজুর (রা.) মু'আবিয়া (রা.) এর দরবারে পৌছে প্রথা অনুযায়ী 'আসসালামু আলাইকুম ইয়া আমীরাল মু'মিনীন' বলে সালাম দিলেন। আমীরে মু'আবিয়া (রা.) প্রথম থেকেই অসন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি জবাব দিলেন, ভালো, আমি কি আমীরুল মু'মিনীন? আমি কখনো তোমাকে ক্ষমা করব না। এর পর তিনি হযরত হুজুর (রা.) কে হত্যার নির্দেশ দিলেন। হযরত হুজুর (রা.) ধৈর্য সহকারে শহীদ হলেন। এ ঘটনায় লোকজন খুবই মর্মাহত হল। হযরত ইবনে উমর (রা.) যখন তা শুনলেন তখন খুবই কাঁদলেন। মারওয়ানের বর্ণনায় আছে, যখন আমীরে মু'আবিয়া (রা.) মদীনা পৌছলেন এবং উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) এর কাছে উপস্থিত হলেন, তখন আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) হুজুর (রা.) এর হত্যার ব্যাপারে খুবই অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। হুজুর (রা.) এর হত্যা খুবই আফসোসজনক ঘটনা ছিল। হযরত মু'আবিয়া (রা.) যা করার তা তো করে ফেলেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে তিনি খুবই মর্মাহত হয়েছিলেন। (তারীখে ইসলাম, পৃষ্ঠাঃ ১৫০-১৫২)

হাফিয ইবনে তাইমিয়ার বিশিষ্ট ছাত্র হাফিয ইমাদ উদ্দীন ইবনে কাসীর তার আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া কিতাবে হুজুর ইবনে আদী (রা.)-এর শাহাদাতের আলোচনায় লিখেছেন: বর্ণিত আছে যে, আমীর মু'আবিয়া (রা.) হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট গিয়ে পর্দার বাইরে থেকে তাকে সালাম দিয়েছিলেন। এটা ছিল হযরত হুজুর ইবনে আদী (রা.) ও তার সাথীগণ নিহত হবার পর। হযরত আয়েশা (রা.) মু'আবিয়া (রা.)-কে বলেছিলেন, 'আপনার ধৈর্য কোথায় গিয়েছিল, যখন আপনি হুজুর (রা.) ও তার সাথীদের হত্যা করেছিলেন? আমীর মু'আবিয়া (রা.) বললেন, 'আম্মাজান ! আমার নিকট থেকে, আমার আশপাশ থেকে আপনার মত মুরব্বীরা যখন দূরে চলে যায় তখন আমার ধৈর্য বিলুপ্ত হয়ে যায়। তার পর মু'আবিয়া (রা.) বললেন, আমি এখন কি করে আপনার সেবা করতে পারি? হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, আপনি তো আমার প্রতি সেবা দানকারী আছেনই। মু'আবিয়া (রা.) বললেন, আমার জন্য আল্লাহর সম্মুখে এতটুকুই যথেষ্ট। কিয়ামতের ময়দানে হুজুর (রা.) ও আমার মধ্যে আল্লাহই ফয়সালা করবেন।

এক বর্ণনায় আছে যে, তিনি বলেছিলেন, 'যারা হযরত হুজুর (রা.)-এর বিরুদ্ধে মু'আবিয়া (রা.)-এর দরবারে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, তারাই তাকে হত্যা করেছিলেন।' ইবনে জারীর (রা.) উদ্ধৃত করেছেন যে, হযরত মু'আবিয়া (রা.)-ইন্তিকালের সময় মুমূর্ষ অবস্থায় বলেছিলেন, হে হুজুর ইবনে আদী! তোমার কারনে এই মৃত্যুক্ষণ আমার নিকট অনেক দীর্ঘ মনে হচ্ছে। এ কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন। (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ৯-১০)

হাম্মাদ ইবনে সালামা মারওয়ান থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত মু'আবিয়া (রা.) হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট গিয়েছিলেন। হযরত আয়েশা (রা.) তখন বলেছিলেন, হে মু'আবিয়া (রা.)! আপনি তো হুজুর (রা.) ও তাঁর সাথীদেরকে হত্যা করেছেন এবং যা অপকর্ম করার করেছেন। এখন আপনি কি এই ভয় করেন না যে, আপনাকে হত্যার জন্য আমি কাউকে লুকিয়ে রেখেছি এবং সে আপনাকে হত্যা করবে? মু'আবিয়া (রা.) বললেন, না আমি ঐ ভয় করি না। কারন আমি একটি নিরাপদ গৃহে অবস্থান করছি। আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, ঈমান হলো গুপ্ত হত্যার বিরোধী। ঈমানদার মানুষ কাউকে গোপনে ও ছলচাতুরী করে হত্যা করে না। অত:পর হে উম্মুল মু'মিনীন! এই বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে আপনার প্রতি আমার আচরণ কেমন পেয়েছেন? আয়েশা (রা.) বললেন ভাল পেয়েছি। হযরত মু'আবিয়া (রা.) বললেন, তবে আমার আর হুজুরের বিষয়টি আমাদের প্রতি ছেড়ে দিন, আমি এবং হুজুর মহান আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হলে তখন তার ফয়সালা হবে।

এক বর্ণনায় আছে যে, হযরত আয়েশা (রা.) মু'আবিয়া (রা.)-কে ধমক দিয়ে আসছিলেন এবং বলছিলেন যে, আমাদের দুর্মুখ ব্যক্তিদের যদি হস্তক্ষেপ করার আশঙ্কা না থাকত তাহলে হুজুরকে হত্যার জন্য আমি মু'আবিয়াকে দেখে নিতাম। অবশেষে হযরত মু'আবিয়া (রা.) উযর পেশ করেন। হযরত আয়েশা (রা.) তাঁর উযর গ্রহন করেন।(আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ১১৪)

হযরত হুজুর ইবনে আদী (রা.)-এর শাহাদাত সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী

ইবনে আসাকির হযরত হুজুর ইবনে আদী (রা.)-এর মৃত্যুতে রচিত বহু শোকগাথা উল্লেখ করেছেন। ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান বলেছেন, হারমালাহ .... আবূ আসওয়াদ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একদা হযরত মু'আবিয়া (রা.) হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট গেলেন। হযরত আয়শা (রা.) বলেছিলেন, আযরায় নিহত হুজুর (রা.) ও তাঁর সাথীদেরকে হত্যা করতে কিসে আপনাকে প্ররোচিত করেছিল? উত্তরে মু'আবিয়া বলেছিলেন, হে উম্মুল মু'মিনীন! ওদেরকে হত্যা করার মধ্যে আমি সাধারণ জনগণের কল্যাণ দেখতে পেয়েছিলাম। আর ওদেরকে বাঁচিয়ে রাখার মধ্যে জনসাধারণের অশান্তি দেখতে পেয়েছিলাম।' অত:পর হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি-"আযরা অঞ্চলে কিছু লোককে হত্যা করা হবে। তাদের হত্যাকাণ্ডে মহান আল্লাহ্ নারাজ হবেন এবং আকাশের অধিবাসী সকলেই নারাজ হবে।"

অবশ্য এই হাদিসের সনদটি দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক ইবনে লাহী'আ সূত্রে আবূ আসওয়াদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আয়েশা (রা.) বলেছিলেন, 'আমার নিকট এই মর্মে বর্ণনা পৌছেছে যে, আযরা অঞ্চলে কতক লোক নিহত হবে, তাদের হত্যাকাণ্ডে মহান আল্লাহ ও আকাশবাসীগণ অসন্তুষ্ট হবেন।'

ইয়াকুব বলেছেন, ইবনে লাহী'আ ...... আব্দুল্লাহ ইবনে রাযীন গাফিকী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আলী (রা.)-কে বলতে শুনেছি, 'হে ইরাকী জনগণ! তোমাদের সাতজন লোক আযরা অঞ্চলে নিহত হবে।' ওদের অবস্থা হবে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ আসহাব-ই-উখদূদ তথা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী লোকদের ন্যায়। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১১৩)

উল্লেখ্য, আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) বলেছেন, হাদীসের সনদে একজন দুর্বল বর্ণনাকারী আছেন। এর অর্থ হাদীসটি দুর্বল। কিন্তু ফাযাইল ও সিরাত এর ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীস গ্রহনযোগ্য এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। এ প্রসঙ্গে ইদ্রীস কান্দুলভী- এর সীরাতুল মুস্তফা থেকে একটি বর্ণনা পেশ করছি।

যেসব হাদীসের উপর দীনের নির্ভরশীলতা বিদ্যমান- যেমন আকাঈদ, হালাল এবং হারাম ইত্যাদি। মুহাদ্দিসীনে কিরাম এগুলো গ্রহণের ব্যাপারে খুবই কঠোরতা অবলম্বন করেছেন এবং যেসব হাদীসের উপর দীন নির্ভরশীল নয় যেমন ফাযাইল এবং মানাকিব ইত্যাদি। এক্ষেত্রে মুহাদ্দিসীনে কিরাম যথাসম্ভব

নমনীয়তা প্রদর্শন করেছেন, কেননা এখানে কোনো আমল উদ্দেশ্য নয় বরং শুধু ইলমই উদ্দেশ্য। এ জন্য এ সব স্থানে শৈথিল্য অবলম্বন করা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, যখন আমরা হালাল ও হারাম সর্ম্পকে রিওয়ায়াত করি তখন আমরা সেখানে কঠোরতা অবলম্বন করি আর যখন ফাযাইল এবং মানাকিব সর্ম্পকে রিওয়ায়াত করি, তখন শৈথিল্য অবলম্বন করি। (সীরাতে মুস্তফা খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৯)
এ প্রসঙ্গে ইমাম নববী (র.) (মৃত্যু: ৬৭৬ হিজরী) আল-আযকার কিতাবের ভূমিকায় লেখেন-

قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم : يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعاً (5) . وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك. كما إذا ورد حديثٌ ضعيفٌ بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة. فإن المستحبَّ أن يتنزّه عنه ولكن لا يجب

হযরত হুজুর ইবন আদী (রা.)-এর বিদায়কালে আপন কন্যাদেরকে অসিয়ত

বর্ণিত আছে যে, বন্দী অবস্থায় হযরত হুজুর ইবন আদী (রা.)- কে যখন কুফা থেকে সিরিয়া নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন তাঁর কন্যাগণ ক্রন্দনরত অবস্থায় তাঁর সম্মুখে আসেন। তিনি তাদের প্রতি মাথা বাড়িয়ে বললেন, 'তোমাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করেন তো আল্লাহ তা'আলা। আমার পরেও তিনি তো আছেনই। সুতরাং তোমাদের কর্তব্য হল আল্লাহভীতি অর্জন করা এবং তাঁর ইবাদত করা। আমি যদি এই যাত্রায় নিহত হই তবে আমি শাহাদাতের মর্যাদায় ভূষিত হব। আর যদি তোমাদের নিকট ফিরে আসি তবে সম্মান ও মর্যাদাবান হয়ে ফিরে আসব। আমার অবর্তমানে মহান আল্লাহ-ই তোমাদের তত্ত্বাবধান করবেন।' তারপর তিনি তাঁর সাথীদের সাথে বন্দী অবস্থায় যাত্রা করলেন। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ১১২)
বর্ণিত আছে যে, ওরা যখন হুজুর (রা.)-কে হত্যা করার প্রস্তুতি নিল তখন তিনি বললেন, তোমরা আমাকে একটু সুযোগ দাও আমি ওযূ করে নিই। তারা বলল, ওযূ করে নিন। তিনি বললেন দু'রাকাত নামায আদায়ের সুযোগ দাও। তারা সুযোগ দিল। তিনি সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাকাত নামায আদায় করলেন। এরপর বললেন, ওরা বলবে আমি মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছি- এ আশংকা না থাকলে আমি নামায দু'রাকাত দীর্ঘ করে আদায় করতাম। তিনি আরো বললেন যে, বহু নামায এই দু'রাকাতের পূর্বে আদায় করা হয়েছে। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ১০৯)

হযরত হুজুর ইবনে আদী (রা.)-এর শাহাদাতের ঘটনায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর প্রতিক্রিয়া

ইমাম আহমদ (র.) ইবনে উলাইয়া সূত্রে ইবনে আওনের মাধ্যমে নাফে' (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বাজারে ছিলেন। এ সময় হযরত হুজুর (রা.)-এর নিহত হবার সংবাদ তাঁর নিকটে আসে। এই সংবাদ শুনে তিনি তাঁর পাগড়ী খুলে ফেললেন এবং উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন। এরপর প্রচন্ড কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ১১৪, আল-ইস্তি'আব, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১৯৮)

হযরত হুজুর ইবনে আদী (রা.)-এর শাহাদাতের ঘটনায় আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর প্রতিক্রিয়া

মাসরুক ইবন আযদঈ বলেন, আমি আয়েশা (রা.)-কে বলতে শুনেছি, মু'আবিয়া (রা.) যদি জানতে পারতেন যে, কুফাবাসীদের প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আছে তবে হুজুর ও তার সঙ্গীদের যুদ্ধ ছাড়া ধরে নিয়ে যেতে পারতেন না। কিন্তু কলিজাখোরের ছেলে জানতে পেরেছে হুজুরের সঙ্গে প্রতিরোধ করার মত মানুষ নেই। (আল-ইস্তি'আব,খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১৯৯)
উপরোক্ত ঘটনা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, হযরত হুজুর (রা.)-এর হত্যার কারণে হযরত আয়শা (রা.) কতটুকু ক্ষুব্ধ ছিলেন।

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.)

হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রা.) এর সম্পর্কে আল্লামা ইদরিস কান্দলভী-এর সীরাতে মুস্তফা কিতাব থেকে কিছু আলোচনা তুলে ধরছি। আম্মার ইবনে ইয়াসির মূলত কাহতানী বংশোদ্ভূত ছিলেন। তাঁর পিতা হযরত ইয়াসির স্বীয় হারিয়ে যাওয়া ভাইয়ের অন্বেষণে মক্কা শরীফ আগমন করেন। তাঁর দু'ভাই হারিস এবং মালিকও তাঁর সাথে ছিল। হারিস ও মালিক ইয়ামনে প্রত্যাবর্তন করেন কিন্তু ইয়াসির মক্কা শরীফ থেকে যান এবং আবু হুযায়ফা মাখযূমীর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। আবূ হুযায়ফা স্বীয় বাঁদি সুমাইয়া বিনতে খাইয়াত এর সাথে ইয়াসিরকে বিয়ে করিয়ে দেন। যার ঔরসে হযরত আম্মার জন্মগ্রহণ করেন। ইয়াসির এবং আম্মার আবূ হুযাইফার মৃত্যু পর্যন্ত একই সাথে বসবাস করতেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইসলামের দাওয়াত দেন তখন ইয়াসির, সুমাইয়া, আম্মার এবং তার ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াসির সবাই ইসলাম গ্রহণ

করেন। হযরত আম্মারের হারিস ইবনে ইয়াসির নামে আরও একজন ভাই ছিলেন, যিনি বয়সে হযরত আম্মার (রা.)-থেকে বড় ছিলেন। তিনি জাহিলিয়া যুগে বনুদদাইল-এর হাতে নিহত হন। (তাবাকাতে ইবনে সা'দ, খণ্ডঃ ৩, পৃষ্ঠাঃ ১৭৬) যেহেতু মক্কা শরীফে আম্মার ইবনে ইয়াসিরের কোনো গোত্র এবং আত্মীয়-স্বজন ছিল না যারা তাঁকে সাহয্য-সহযোগিতা করতে পারে, তাই কুরাইশরা তাঁকে প্রচুর কষ্ট দেয়। ঠিক দ্বি-প্রহরের সময় উত্তপ্ত জমিতে তাঁকে শুইয়ে দিত এবং এমনভাবে প্রহার করত যে, তিনি বেহুঁশ হয়ে যেতেন। কখনো কখনো পানিতে ডুবিয়ে ধরত, কখনো কখনো উত্তপ্ত কয়লার উপর শুইয়ে দিত। এমতাবস্থায় যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আম্মারের পাশ দিয়ে যেতেন তখন তিনি তাঁর মাথায় হাত রেখে ইরশাদ করতেন–

অর্থাৎ হে আগুন! তুমি আম্মারের জন্য ঠাণ্ডা এবং শান্তিপ্রদ হয়ে যাও, যেভাবে তুমি ইব্রাহীম (আ.)-এর উপর ঠাণ্ডা এবং শান্তিপ্রদ হয়েছিলে।

যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আম্মার (রা.) ও তার পিতা ইয়াসির এবং মাতা সুমাইয়াকে এ অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশায় লিপ্ত দেখতে পেতেন, তখন তিনি বলতেন, হে ইয়াসির পরিবারের সদস্যবৃন্দ, তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। কখনো কখনো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা ইরশাদ করতেন, হে আল্লাহ! আপনি ইয়াসির পরিবারের সদস্যদের পাপ মার্জনা কর, জান্নাত তোমাদের জন্য অপেক্ষা করবে। (তাবাকাতে ইবনে সা'দ, খণ্ডঃ ১, ইস্তী'আব লি-ইবনে আব্দিল বার, তাযকিরায়ে আম্মার)

হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, আম্মারের আপাদমস্তক ঈমানে পরিপূর্ণ। এ হাদীসটি তিরমিযী ও ইবনে মাজায় বর্ণিত আছে, এর সনদ হচ্ছে উত্তম। (আল-ইসাবা খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ৫১২)

হযরত আম্মার (রা.) একদা স্বীয় জামা খুললে তাঁর পিঠ মুবারকের মধ্যে লোকজন কালো কালো দাগ দেখে জিজ্ঞেস করেন, আপনার পিঠে এরূপ কালো কালো দাগ কেন? উত্তরে তিনি বলেন, মক্কার কুরাইশগণ আমাকে উত্তপ্ত প্রস্তরখণ্ডের উপর শুইয়ে দিত। এসব দাগ এ কারনেই হয়েছে। (তাবাকাতে ইবনে সা'দ, খণ্ডঃ ৩, পৃষ্ঠাঃ ৭৭)

কুরাইশগণ এ রকম ব্যবহার হযরত আম্মারের পিতা-মাতার সাথেও করত। মুজাহিদ বলেন, সর্বপ্রথম সাতজন ব্যক্তি ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার প্রকাশ্য ঘোষনা করেন। যথা- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.), হযরত বিলাল (রা.), হযরত খাব্বাব (রা.), হযরত সুহাইব (রা.), হযরত আম্মার (রা.), এবং হযরত সুমাইয়া (রা.)। বংশীয় আভিজাত্যের কারণে

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং হযরত আবু বকর (রা.)-এর উপর মক্কার মুশরিকদের পুরো কর্তৃত্ব চলছিল না, অবশ্য হযরত বিলাল (রা.), হযরত খাব্বাব (রা.), হযরত সুহাইব (রা.), হযরত আম্মার (রা.) এবং হযরত সুমাইয়া (রা.)-এর উপর মক্কার মুশরিকরা যার পর নাই অসহনীয় নির্যাতন চালিয়েছিল। ঠিক দ্বি-প্রহরের সময় এসব সাহাবায়ে কিরামকে লৌহবর্ম পরিধান করিয়ে প্রচণ্ড রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে রাখত। একদিন তাদের সম্মুখে আবূ জেহেল এসেই হযরত সুমাইয়া (রা.)-এর লজ্জাস্থানের উপর একটি বল্লম নিক্ষেপ করে, যার আঘাতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। আবু বকর ইবনে আবী শায়বাহ মুজাহিদ থেকে এ হাদীস রিওয়ায়াত করেন, এ হাদীসটি মুরসাল এবং এর সনদ বিশুদ্ধ। (আল-ইসাবা, খণ্ডঃ ৪, পৃষ্ঠাঃ ৩৩৫)

তাবাকাতে ইবনে সা'দের 'তরজমায়ে সুমাইয়া (রা.)' অধ্যায়ে বিশুদ্ধ সনদে মুজাহিদ হতে বর্ণিত আছে যে, ইসলামের সর্বপ্রথম শহীদ হচ্ছেন হযরত সুমাইয়া (রা.) যিনি খুবই বৃদ্ধা এবং দুর্বল ছিলেন। আবূ জেহেল যখন বদর যুদ্ধে নিহত হয়, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আম্মারকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেন–''আল্লাহ তোমার মাতার হত্যাকারীকে হত্যা করেছেন।''

হযরত ইয়াসির (রা.) কুরাইশ কাফিরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে হযরত সুমাইয়া (রা.)-এর পূর্বে ইন্তেকাল করেন। (ফতহুল বারী খণ্ডঃ ৭, পৃষ্ঠাঃ ১৭) এখানে সীরাতে মোস্তফা ১ম খণ্ড ২২৯-২৩০ পৃষ্ঠার আলোচনা শেষ হলো।

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, মসজিদে নববী নির্মাণের সময় হযরত আম্মার (রা.) ছাড়া অন্যান্য সাহাবী একটি করে ইট বহন করছিলেন। আর আম্মার (রা.) দু'টি করে ইট বহন করছিলেন। তা দেখে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর শরীর থেকে ধুলাবালি ঝাড়তে লাগলেন এবং বললেন, হায়! আম্মারকে বিদ্রোহী দল হত্যা করবে।

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় আনওয়ারুল বারী কিতাবে লিখেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আম্মার (রা.) কে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন দু'টি করে আনছো? আম্মার (রা.)-এর পক্ষ থেকে তার দুইটি জবাব বর্ণিত আছে।

১। আমি অধিক সওয়াব পাওয়ার আশায় এটি করছি।

২। একটি আমার এবং অপরটি আপনার পক্ষ থেকে বহন করছি। একথা শুনে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুশি এবং দুঃশ্চিন্তাপূর্ণ মনোভাব নিয়ে বললেন, হায়! আম্মারের শাহাদাত এক বিদ্রোহী দলের হাতে হবে। (আনওয়ারুল বারী, খণ্ডঃ ১৪, পৃষ্ঠাঃ ৫৪)

হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রা.)-এর শাহাদত

সিফফীনের যুদ্ধে হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রা.) হযরত আলী (রা.) এর পক্ষে যুদ্ধ করে শাহাদত বরণ করেন। তার শাহাদত ও এর হাকীকত সম্পর্কে মুফতি সৈয়দ আমিমুল ইহসান (র:) এর লিখিত 'তারীখে ইসলাম' থেকে কিছু আলোচনা তুলে ধরছি।

হযরত আলী (রা.) এর সৈন্যদের মধ্যে হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রা.) এর ব্যক্তিত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তিনি বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত . প্রথমদিকে ইসলাম গ্রহনকারী বয়স্ক সাহাবীদের একজন ছিলেন। সাইয়িদুল কাওনাইন সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় হিজরতের পর মসজিদে নববী নির্মানের সময় সবচেয়ে বেশী পাথর তিনি বহন করে ছিলেন। তার সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, ويح عمار تقتله الفئة الباغية "আম্মারের জন্য আফসোস। তাঁকে একটি বিদ্রোহি দল হত্যা করবে"। (বুখারি, বাব التعاون في بناء المسجد)

সিফফীনের যুদ্ধের ৫ম দিন হযরত আম্মার (রা.) কাতার থেকে সামনে এগিয়ে এলেন এবং মুয়াবিয়া (রা.) এর সৈন্যদের মুকাবিলা আরম্ভ করলেন। তুমুল যুদ্ধ শুরু হল। যুদ্ধে তিনি শহীদ হলেন। তাঁর শাহাদাতে হযরত আলী (রা.) খুবই মর্মাহত হলেন। হযরত মুয়াবিয়াও (রা.) আফসোস করলেন। হযরত আমর বিন আস (রা.)ও বললেন, 'হায়! যদি আমি আরো বিশ বছর আগে মারা যেতাম'। (তারীখে ইসলাম, পৃষ্ঠা: ১০৪)

এ হাদীস থেকে আল্লামা বদরুদ্দীন আইনি (র:) একটি ফায়দা বের করেছেন। তা হল-

وفيه فضيلة ظاهرة لعلي وعمار ورد علي النواصب الزاعمين ان عليا لم يكن مصيبا في حروبه

এ হাদীস থেকে হযরত আলী (রা.) ও আম্মার (রা.) এ স্পষ্ট ফযীলতের কথা বুঝা যায়। এ হাদীস দ্বারা এদের দাবীও প্রত্যাখ্যাত হয় যারা মনে করে হযরত আলী (রা.) এর সময়ে, (মুয়াবিয়ার বিরোধে) সংঘটিত যুদ্ধসমূহ সঠিক ছিল না। (উমদাতুল কারী খণ্ড: ৪.পৃষ্ঠা: ২৭)

ইমাম ইবন হজর আসকালানী (র:) ফতহুল বারী কিতাবে লিখেন:

وفي هذا الحديث علم من اعلام النبوة و فضيلة ظاهرة لعلي وعمار وردة علي النواصب الزاعمين ان عليا لم يكن مصيبا في حروبه

এ হাদীসে রয়েছে নবুয়তের নিদর্শন সমূহের একটি নিদর্শন এবং হযরত আলী (রা.) ও আম্মার (রা.) এর স্পষ্ট ফযীলতের বর্ণনা। আরো রয়েছে ঐ সব লোকেদের প্রত্যখান যারা মনে করে- হযরত আলী (রা.) (মু'আবিয়ার বিরুদ্ধে) তার যুদ্ধসমূহে সঠিক ছিলেন না। (ফতহুল বারী, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪৫২)

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.) সম্পর্কে কিছু আলোচনা

প্রকাশ থাকে যে, হযরত আলী (রা.) এর খিলাফতের হক্কানিয়ত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদার অন্তর্গত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, একারণে আমরা এ সম্পর্কিত কিছু আলোচনা বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আনওয়ারুল বারী' থেকে উল্লেখ করছি।

যেহেতু আম্মার (রা.) সম্পর্কে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপরোল্লেখিত বাণী সকল সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে খুবই প্রশিদ্ধ ছিল, যার বর্ণনা বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি, নাসাঈ, আবু দাউদ, মুসনাদে আহমদ ইত্যাদি কিতাবসমূহে রয়েছে। অনেক সাহাবী ও তাবিঈ- যারা হযরত মু'আবিয়া (রা.) ও আলী (রা.) এর মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে কে সঠিক, এ ব্যাপারে সন্দেহযুক্ত ছিলেন, হযরত আম্মার (রা.) এর শাহাদতের মাধ্যমে তারাও অবগত হলেন যে, দু'দলের মধ্যে কারা হকপন্থী ছিলেন এবং কারা বাতিল। হাফিয ইবনে হজর (র.) 'আল ইসাবা' কিতাবের ২য় খণ্ড, ৫০২ পৃষ্ঠায় লেখেন- হযরত আম্মার (রা.) এর শাহাদতের মাধ্যমে একথা পরিস্কার হয়ে গেছে যে, সত্য হযরত আলী (রা.) এর সাথে ছিল। আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতও এর উপর এক মত হয়ে গেছেন। যদিও ইতি পূর্বে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল। 'আল ইসাবা' কিতাবের ২য় খণ্ড, ৫০৬ পৃষ্ঠায় এবং 'আতহযীবুত তাহযীব' ৭ম খণ্ড, ৪১০ পৃষ্ঠায় আছে, মুতাওয়াতির বর্ণনা থেকে একথা বর্ণিত আছ যে, হযরত আম্মার (রা.) কে বিদ্রোহী গ্রুপ হত্যা করেছে। 'আলইস্তিআব, ২য় খণ্ড, ৪২৪ পৃষ্ঠায় আল্লামা মুহাক্কিক ইবনে আব্দুল বারও এ কথা লেখেছেন। হাফিয ইবনে কাসীর 'আল-বিদায়া', ৭ম খণ্ড, ২৭০ পৃষ্ঠায় লেখেছেন, হযরত আম্মার (রা.) এর শাহাদতের মাধ্যমে এ হাদীসের রহস্য খুলে গেছে যে হাদীষে বর্ণিত আছে যে, আম্মার (রা.) কে এক বিদ্রোহী গ্রুপ হত্যা করবে। এ থেকে এ কথাও প্রকাশিত হল যে, হযরত আলী (রা.) সত্য পন্থী ছিলেন এবং হযরত মু'আবিয়া (রা.) বিদ্রোহী ছিলেন। ৭ম খণ্ড, ২৪১ পৃষ্ঠায় এও লিখেছেন যে, উষ্ট্রের যুদ্ধে হযরত যুবাইর (রা.) হঠে যাওয়ার এটিও একটি কারণ ছিল যে, হযরত আম্মার (রা.) সম্পর্কে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর বাণী তাঁর স্মরণ হয়ে গিয়েছিল। যখন তিনি দেখলেন আম্মার (রা.) হযরত আলী (রা.) এর সেনাদলে নিযুক্ত হয়েছেন। কিন্তু যখন সিফফিনের যুদ্ধে হযরত আম্মার (রা.) এর শাহাদতের সংবাদ হযরত মু'আবিয়া (রা.) এর সৈন্যদের কাছে পৌছল, এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রা.) তাঁর পিতা এবং মু'আবিয়া (রা.) কে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর এর বাণীর কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন, তখন হযরত মু'আবিয়া (রা.) সাথে সাথে জবাব দিলেন যে, আম্মার (রা.) কে তো আমরা

হত্যা করিনি। তাঁকে হত্যা করেছে তারাই যারা তাঁকে যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে এসেছে। (তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, ২৯ পৃষ্ঠা, ইবনুল আসীর, ৩য় খণ্ড, ১৫৮ পৃষ্ঠা, বেদায়া, ৭ম খণ্ড, ২৬৮ পৃষ্ঠা)। আল্লামা ইবনে কাসীর মু'আবিয়া (রা.) এর এ তাবীলকে অনেক অসঙ্গত বলেছেন। (আনওয়ারুল বারী, খণ্ড, ১৪, পৃষ্ঠা: ৫৫)

হযরত আলী (রা.) এর খেলাফতের হক্কানিয়ত সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের অবগতির জন্য বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আনওয়ারুল বারী'র একটি আলোচনা তুলে ধরছি।

انوار الباری ۵۶ جلد(۱۳)

خلافت حضرت علیؓ

اس حدیث بخاری سے یہ بھی معلوم ہوا کہ چوتھے نمبر پر خلافت برحق ان ہی کی تھی اور ان کی مخالفت بغاوت تھی، اگرچہ امر اجتہادی ہونے کی وجہ سے حضرت معاویہ اور ان کے ساتھی ماخوذ نہ ہوں، اس کے لئے جا بجا کہ موالہ ام حضرت شاہ صاحبؒ کے ارشاد میں گذر چکا ہے اور فتح القدیر، شرح فقہ اکبر، احکام القرآن ابن عربی وغیرہ میں بھی اسی طرح ہے اور علاوہ بھی ایک شام کے صوبے کو چھوڑ کر جزیرۃ العرب اور اس کے علاوہ تمام اسلامی مفتوحات کے مسلمانوں نے حضرت علیؓ کی خلافت کو مان لیا تھا اور مدینہ طیبہ میں تو دوسرے خلفاء سابقین کی طرح اکابر مہاجرین و انصار نے حضرت علیؓ کے ہاتھ پر باقاعدہ بیعت کر لی تھی۔

حضرت شاہ عبدالعزیزؒ نے ایک سوال کے جواب میں تحریر فرمایا کہ مروان کو برا کہنا اس سلوک کی وجہ سے جو اس نے حضرت حسنینؓ و دیگر اہل بیت کے ساتھ روا رکھا، اس سے دل بیزاری رکھنا لوازم سنت و محبت اہل بیت سے ہے، جو فرائض ایمان کا مقتضی ہے، لیکن حضرت معاویہؓ ایک صحابی تھے، ان کے حق میں بعض احادیث بھی وارد ہیں اور علماء اہل سنت ان کے بارے میں مختلف ہیں، علماء ماوراء النہر اور مفسرین و فقہاء ان کی تمام حرکات جنگ و جدال کو جو حضرت علیؓ سے کیں، خطاء اجتہادی پر محمول کرتے ہیں اور محققین اہل حدیث نے تتبع روایات صحیحہ کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ حرکات شائبہ نفسانی اور تعصب اموی و قرابت عثمانی سے خالی نہ تھیں، پس ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ مرتکب کبیرہ اور باغی ہوں گے جس سے فسق لازم ہوا، مگر فاسق پر لعنت جائز نہیں، لہٰذا ان کے لئے دعاء مغفرت و شفاعت کر لیں تو بہتر ہے۔ (فتاوی عزیزی ص ۲۷۷ ج ۱)

حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا کہ اس حدیث رسول ﷺ سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت معاویہ کی خلافت امام وقت پر بغاوت کرنے کے بعد منعقد ہوئی (ازالۃ الخفاء ص ۲۷۵ ج ۱) اور لکھا کہ حضرت معاویہ تو کہتے تھے کہ میرے دل میں خلافت کی خواہش اس وقت سے ہے کہ حضور علیہ السلام سے میں نے یہ سنا تھا کہ اے معاویہ! اگر تم بادشاہ ہو جاؤ تو لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا اور وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ میں خلیفہ نہیں ہوں بلکہ بادشاہان اسلام کا پہلا بادشاہ ہوں اور جب تم میرے بعد بادشاہوں کا تجربہ کرو گے تو اس وقت میری قدر جانو گے الخ (ازالۃ الخفاء ص ۳۳۵ ج ۱)

یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ علماء اہل سنت میں سے کوئی بھی ایسا نہیں گذرا جس نے حضرت عثمانؓ کے بعد حضرت علیؓ کو چوتھا خلیفہ راشد تسلیم نہ کیا ہو یا ان کی بیعت کے صحیح ہونے میں شک کیا ہو، بلکہ علماء حنفیہ نے تو ان کی خلافت کے اقرار کو عقائد اہل سنت میں سے ایک عقیدہ قرار دیا ہے، اور یہ بھی سب ہی نے تسلیم کیا ہے کہ ان کے ساتھ جتنی لڑائیاں ہوئیں ان سب میں حق ان ہی کے ساتھ تھا، البتہ اس سلسلہ میں بھی علامہ ابن تیمیہ کا تفرد معلوم ہوتا ہے جیسا کہ منہاج السنہ کی بعض عبارتوں سے ظاہر ہوتا ہے، ملاحظہ ہو ترجمہ عبارات منہاج السنہ کے لئے کتاب "امام ابن تیمیہ" افضل العلماء محمد یوسف کوکن عمری مدراسی ص ۵۰۵ و ص ۵۰۹۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.) এর ফযিলত সম্পর্কে অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে। কয়েকটি হাদীস নিম্নে পেশ করা হলো-

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.) এর আপাদমস্তক ঈমানে ভরপুর ছিল। (মুসতাদরক, বায়হাকী তার সুনানে কুবরা কিতাবে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। হাফিয ইবনে হাজর আসকালানি ফতহুল বারী কিতাবে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।)

২. হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তিন ব্যক্তির জন্য বেহেশত আগ্রহী। তারা হলেন, আলী (রা.), আম্মার (রা.) এবং সালমান (রা.)। (তিরমিযী)

৩. হযরত আবু সিনান আদ দুয়াইলী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আম্মার ইবনে ইয়াসিরকে দেখেছি (সিফ্‌ফিনের দিন) পানি নিয়ে আসার জন্য বলছেন। তখন তার জন্য এক পিয়ালা দুধ আনা হলো। তিনি তা পান করে বললেন, আল্লাহ ও তার রাসূল ঠিকই বলেছেন। আজ আমি বন্ধুদের (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথীদের) সাক্ষাৎ লাভ করব, কেননা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তুমি দুনিয়ার সর্বশেষ যে পানি পান করবে তা হবে এক পিয়াস দুধ। (মসনদে আহমদ, হায়সামি বলেছেন হাদীসটি সহীহ।) উল্লেখ্য: হযরত আম্মার (রা.)'র শাহাদত বরণের সময় তাঁর বয়স ছিল ৯৩ অথবা ৯৪ বছর।

৪. হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আম্মারকে যে কোন দুইটি বিষয়ের মধ্যে পছন্দ করার এখতিয়ার দেওয়া হলে সে দুইটির মধ্যে অধিক কল্যানপূর্ণটি পছন্দ করবে। (তিরমিযী)

সিফফিনের যুদ্ধে হযরত ওয়েস করনী (রা.)-এর শাহাদাত বরণ

সিফফিনের যুদ্ধে হযরত আলী (রা.) সত্যের উপর ছিলেন, সেটা শুধু ঐতিহাসিক বিষয় নয়, সেটা আকিদারও বিষয়। এ সম্পর্কে আলোচনা যথাস্থানে করা হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আহলে বাইতের আশিক সর্বশ্রেষ্ট তাবিয়ী হযরত ওয়েস করনী (রা.) আহলে বাইতের সঙ্গী হয়ে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেছেন। আল্লামা ইবনুল আসির (র.)-তাঁর 'উসদুল গাবাহ' কিতাবে লিখেছেন: হিশাম কালবী বলেন, ওয়েস করনী (রা.) সিফফিনের যুদ্ধে আলী (রা.)-এর

পক্ষে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেছেন, ইবনে মাজাহ, আবু নু'আইম। (উসদুল গাবা,খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১৫১-১৫২)

শাইখুল হাদীস যাকারিয়া ছাহেব তার 'ফাযাইলে' হজ্জ কিতাবে লিখেন, ওয়েস করনী (রা.) সিফফিনের ময়দানে হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষে যুদ্ধ করে শহীদ হন। তিনি হজ্জ করে মদিনায় এসে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করেন। তখন কেউ একজন ইশারায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রওজায়ে আতহার দেখিয়ে দেয়া মাত্র তিনি বেহুশ হয়ে পড়ে যান। হুশ হওয়ার পর বলেন, যেখানে আমার প্রিয় নবী শুয়ে আছেন, আমি কি করে সেখানে শান্তি পাবো। তোমরা আমাকে এখান হতে নিয়ে যাও।(ফাযাইলে হজ্জ)

মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, হযতর উমর (রা.) বলেন- আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, ওয়েস করনী হলেন তাবিয়ীগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ট ব্যাক্তি। তাঁর মা জীবিত আছেন, সে শ্বেত রোগী, তোমরা তাকে তালাশ করো যাতে সে তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। (মুসলিম)

হযরত ওয়েস করনী (রা.) এর ফযিলত সম্পর্কে ইমাম নববী (র.)-এর রিয়াদুস-সালেহীন কিতাব থেকে কিছু আলোচনা তুলে ধরছি।

হযরত উমাইর ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত : তাঁকে ইবনে জাবিরও বলা হয়। তিনি বলেন, হযরত উমর (রা.)-এর কাছে ইয়েমেন হতে (ইসলামী খেলাফতের) সহযোগী যুদ্ধারা এলে তিনি তাদের জিজ্ঞেস করতেন, তোমাদের মধ্যে 'উয়াইস ইবনে আমির' নামক কোন ব্যক্তি রয়েছে কি? অবশেষে (একদিন) ওয়েস (র.) (মদিনায়) এসে গেলেন। হযরত উমর (রা.) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি উয়াইস ইবনে আমির? হযরত ওয়েস (র.) বললেন, হ্যাঁ। হযরত উমর (রা.) বললেন, আপনি কি মুদর গোত্রের উপগোত্র-কারন গোত্রের? তিনি বললেন, হ্যাঁ। হযরত উমর (রা.) পুনরায় তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কি কুষ্ঠরোগ হয়েছিল, অতপর তা হতে সুস্থ হয়েছেন এবং (এখনো আপনার দেহে) এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা শ্বেতবর্ণের হয়ে আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। হযরত উমর (রা.) বললেন, আপনার মা কি বেঁচে আছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি (হযরত উমর) (রা.) বললেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি: "ইয়েমেনের সহযোদ্ধা দলের সাথে উয়াইস ইবনে আমির নামক এক ব্যক্তি তোমাদের নিকট আসবে। সে মুদর গোত্রের উপগোত্র 'কারন' গোত্রের হবে। তাঁর কুষ্ঠরোগ হয়েছিল এবং তা হতে সে পরিত্রাণ পেয়েছে। (তার দেহের) শুধু এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা (শ্বেতবর্ণ) রয়ে গেছে। তাঁর মা জীবিত রয়েছেন, সে তার (মায়ের) খুবই অনুগত। তিনি আল্লাহর উপর নির্ভর করে কোন কিছুর শপথ করলে মহান আল্লাহ তা পূরণ করে দিবেন। যদি তুমি তাঁকে দিয়ে গোনাহ মাফের জন্য প্রার্থনা করিয়ে নিবার সুযোগ পাও, তবে তাই করবে। হযরত উমর (রা.) বললেন, সুতরাং আমার গোনাহ্ মোচনের জন্য দু'আ করুন।

অতপর তিনি (ওয়েস) তাঁর গোনাহ মাফের জন্য দু'আ করেন। অত:পর হযরত উমর (রা.) তাঁকে বললেন, আপনি কোথায় যাবেন? তিনি বললেন, কূফা যেতে চাই। তিনি বললেন, আমি সেখানকার গভর্ণরকে আপনার (সাহায্যের) জন্য লিখে দেই? তিনি বললেন, দরিদ্র-মিসকিনদের মধ্যে বসবাস করাই আমার কাছে অধিক প্রিয়। পরবর্তী বছর কূফার নেতৃস্থানীয় এক ব্যক্তি হজ্জে আসলেন। তাঁর সঙ্গে হযরত উমর (রা.)-এর সাক্ষাত হলে তিনি ওয়েস সর্ম্পকে তাকে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, তাঁকে আমি এমন অবস্থায় রেখে এসেছি, তাঁর বসবাসের ঘরটি অত্যন্ত জীর্ণশীর্ণ অবস্থায় রয়েছে এবং তাঁর জীবনোপকরণ খুবই সামান্য। হযরত উমর (রা.) বললেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি: "ইয়েমেনের সহযোদ্ধা দলের সাথে ওয়েস ইবনে আমির নামক এক ব্যক্তি তোমাদের নিকট আসবে। সে মুদার গোত্রের উপগোত্র 'কারন' গোত্রের হবে। তাঁর কুষ্ঠরোগ হয়েছিল এবং তা হতে সে পরিত্রাণ পেয়েছে। (তার দেহের) শুধু এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা (শ্বেতবর্ণ) রয়েগেছে। তার মা জীবিত রয়েছে, সে তার (মায়ের) খুবই অনুগত। তিনি আল্লাহর উপর নির্ভর করে কোন কিছুর শপথ করলে মহান আল্লাহ তা পূরণ করে দিবেন। যদি তুমি তাঁকে দিয়ে গোনাহ মাফের জন্য প্রার্থনা করিয়ে নিবার সুযোগ পাও, তবে তাই করবে"। এ ব্যক্তি হিজায (মক্কা-মদিনা) হতে প্রত্যাবর্তন করে হযরত ওয়েস করনীর নিকট গিয়ে বললেন, আপনি আমার গোনাহ মাফের জন্য প্রার্থনা করুন। তিনি (ওয়েস) বললেন, আপনি সবেমাত্র কল্যাণময় ভ্রমন হতে ফিরে এসেছেন, বরং আপনিই তো আমার গোনাহ মাফের জন্য প্রার্থনা করবেন। অতপর হযরত ওয়েস তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি হযরত উমর (রা.)'র সাথে সাক্ষাৎ করেছেন? তিনি বলল হ্যাঁ। এ কথা শোনার পর হযরত ওয়েস করনী (রা.) তাঁর জন্য দু'আ করলেন। সুতরাং মানুষ হযরত ওয়েস করনী (রা.)-এর মর্যাদা সম্পর্কে বুঝে গেল। এরপর হযরত ওয়েস করনী (রা.) সেখান হতে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। ইমাম মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। (রিয়াদুস সালেহীন)

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) নিজস্ব সনদে হাদীস উল্লেখ করেছেন; রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, রবিয়া ও মুদার গোত্রের সমপরিমাণ লোক আমার উম্মতের এমন এক ব্যক্তির শাফায়াতে মুক্তি পাবেন, যিনি নবী নন। (আয-যুহদ)

উক্ত হাদীস উল্লেখ করার পর ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) লিখেন, হাসান বলেছেন, তারা সবাই (বিদ্ধানগণ) মনে করতেন তিনি উসমান (রা.) অথবা ওয়েস করনী (রা.) হবেন। (আয-যুহদ)

বনু উমাইয়ার সমর্থক সামদেশীয় মুনাফিকদের হাতে হযরত নুমান বিন বাশীর (রা.)-এর শাহাদাত বরণ

ইবনে সা'দ এর বরাতে ইমাম জালাল উদ্দীন সূয়ূতী (র.) হযরত নুমান বিন বাশীর (রা.)-এর শাহাদাত সম্পর্কে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একটি ভবিষ্যৎবাণী উল্লেখ করেছেন।

একবার নুমান বিন বাশীর (রা.)-এর মাতা তাঁকে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত করলেন এবং বললেন, আমার বাচ্চার জন্য দু'আ করুন। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি কি পছন্দ কর না যে, তুমি যে মর্যাদায় পৌছেছো তোমার ছেলে সে মর্যাদায় পৌছুক। অতপর সে সিরীয়ায় যাক এবং সিরীয়ার মুনাফিকরা তাকে শহীদ করুক। (খাসাইসে কুবরা, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩১৪, কানযুল উম্মাল, খণ্ড: ১১, পৃষ্ঠা: ৩৪২)

হাফিয ইমাদ উদ্দীন ইবনে কাসির (র.) আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া কিতাবে বর্ণনা করেন: আন নু'মান ইবনে বাশীর (রা.) ছিলেন হিজরতের পরে মদীনায় আনসারদের মধ্যে প্রথম জন্মগ্রহণকারী সন্তান। আর তা ছিল ষষ্ঠ হিজরীর জামাদিউল আউয়াল মাস। জন্মের পর তাঁর মাতা তাকে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে 'তাহনীক' করান, অর্থাৎ কিছু খেজুর চিবিয়ে তার মুখে দেন এবং তার মাকে সুসংবাদ দেন যে, সন্তানটি খুবই সুখে জীবন যাপন করবে। সন্তানটি শাহাদাত বরণ করবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড: ৮ পৃষ্ঠা: ৪৪৪)

ইবনে সা'দ মাসলাম বিন মাহারিব থেকে বর্ণনা করেছেন, মারওয়ানের শাষনামলে দিহাক (রা.) মারাজ রাহিতের দিন শাহাদাত বরণ করেন। তখন নুমান বিন বাশীর (রা.) হিমস থেকে পলায়নের ইচ্ছা করেন। তিনি ছিলেন হিমস এর গভর্ণর। কিন্তু হিমসবাসীরা তার বিরোধিতা করে। নুমান বিন বাশীর (রা.) আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.)-এর পক্ষে দাওয়াত দিচ্ছিলেন, এ জন্য তারা তাকে হত্যা করে। (খাসাইসে কুবরা, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩১৪)

প্রকাশ থাকে যে, হযরত নুমান বিন বাশীর (রা.) আহলে বাইতের ভক্ত ছিলেন। এজন্যই তিনি মারওয়ানের অধীনে কোন দায়িত্ব পালন করতে নারাজ ছিলেন। এটাই তাঁর শাহাদাতের কারন। তিনি যে শহীদ হয়েছেন, আর তার হত্যাকারীরা মুনাফিক ছিল উপরে বর্ণিত হাদীসটি ইহার প্রমাণ।

মোটকথা: বনী উমাইয়ার সমর্থকদের মধ্যে অনেক মুনাফিক ছিল একথা বলা অমূলক নয়।

আমিরুল মু'মিনীন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা.) খেলাফতের আসনে আসীন হন ৬৪ হিজরীতে। সে বছর তিনি সব মানুষকে নিয়ে হজ্জ পরিচালনা করেন। তাঁর খালা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) এর কাছ থেকে শুনেছিলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাস কা'বা ঘরকে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর নির্মানকৃত কা'বার ন্যায় নির্মান করার ইচ্ছা পোষন করতেন। এজন্য তিনি তাঁর শাসনামলে কা'বা ঘর পুনঃনির্মাণ করেন এবং তাতে রেশমী গিলাফ চড়ান। তার আগে কা'বার গিলাফ ছিল চামড়া ও পশমের।

ইবনুয যুবাইর আলিম, ইবাদতকারী, আল্লাহভীরু, আত্ম-মর্যাদাবোধসম্পন্ন, অধিক রোযা-নামায আদায়কারী, অত্যধিক বিনয়ী ও উত্তম রাজনীতিবিদ ছিলেন। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ৫৯৩)

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর কন্যা আসমা (রা.)'র সাথে আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের গভর্নর হাজ্জাজের দুর্ব্যবহার-

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) এর শাহাদাতের পর যখন হযরত আসমা (রা.) তাঁর ছেলেকে দেখতে আসেন তখন হাজ্জাজও আসল এবং আসমা (রা.) কে উদ্দেশ্যে করে বলল, আল্লাহ সত্যকে সাহায্য করেছেন এবং বিজয় দান করেছেন। এর উত্তরে আসমা (রা.) বললেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। সে ইসলামের যুগে মদীনায় সর্বপ্রথম জন্মলাভকারী সন্তান। তাঁর জন্মে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনন্দিত হয়েছিলেন এবং তাকে নিজ হাতে তাহনীক করেছেন। মুসলমানরা সেদিন তাকবীর ধ্বনি দিয়েছিল। এমনকি তাঁর প্রতি আনন্দ প্রকাশ করতে গিয়ে মদীনা প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল। অথচ তুমি এবং তোমার সহচরগণ খুশী তাঁর হত্যাকাণ্ডে। সেদিন তাঁর জন্মে যাঁরা আনন্দিত হয়েছিলেন তারা তোমার এবং তোমার সহচরদের তুলনায় উত্তম ছিলেন। তা ছাড়া সে পিতা মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহারকারী, অধিক রোযা পালনকারী, আল্লাহর কিতাব প্রতিষ্ঠাকারী এবং হারমের মর্যাদা রক্ষাকারী ছিল। যারা আল্লাহর নাফরমানী করত, সে তাদেরকে ঘৃণা করত। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, সাক্বীফ থেকে একজন মিথ্যাবাদী ও একজন অত্যাচারী আত্মপ্রকাশ করবে। অপর এক বর্ণনায় আছে, সাক্বীফ থেকে দু'জন মিথ্যাবাদী আবির্ভূত হবে, যাদের শেষেরজন প্রথমজন অপেক্ষা অধিক নিকৃষ্ট। ফলে হাজ্জাজ ক্ষুব্ধ হল এবং ভগ্নহৃদয়ে ফিরে গেল। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ৫৯৫)

এ শিরোনামের অধীনে আমরা এমন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ করব যা থেকে ইনশাআল্লাহ প্রমাণিত হবে উমর ইবনে আব্দুল আযিয (রা.) ব্যতিত বনু উমাইয়া শাসকগণ কেবল একটি কারবালাই ঘটায়নি বরং আরো অনেক কারবালাও ঘটিয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমীরুল মুমীন আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) এর বিরুদ্ধে হাজ্জাজ বিন ইউসূফের যুদ্ধের ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। নিম্নে হাফিয ইমাদ উদ্দিন ইবনে কাসীর (র:) এর আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া কিতাব থেকে কিছু আলোচনা তুলে ধরা হলো।

তাঁর নাম আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর ইবনে আওয়াম ইবনে খুয়াইলিদ ইবনে আসাদ ইবনে আবদুল উযযা ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব ইবনে বকর। কেউ কেউ তাকে আবু খুযাইব আল-কুরায়শী আল-আসাদী বলে থাকেন। তিনি মদীনায় হিজরতের পর মুহাজিরদের সর্বপ্রথম জন্মগ্রহনকারী সন্তান। তাঁর মাতা হলেন হযরত আসমা বিনতে আবু বকর 'যাতুন্নিতাকাইন'। হযরত আসমা (রা.) যখন হিজরত করেন, তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) তাঁর গর্ভে ছিলেন। তাঁদের মদীনা আগমনের পর সর্বপ্রথম কুবায় তাঁর জন্ম হয়। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড: ০৮, পৃষ্ঠা: ৫৮২)

ইমাম আহমদ যথাক্রমে আবু উসামা, হিশাম ও আবু হিশাম সূত্রে আসমা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আবদুল্লাহকে মক্কায় থাকা অবস্থায় গর্ভে ধারন করেন। তিনি বলেছেন, তার পর যখন আমি তাঁকে গর্ভে নিয়ে রওয়ানা হই, তখন আমার গর্ভের পূর্ণ মেয়াদ। আমি মদীনায় আগমন করে কূবায় অবতরণ করলাম। তখন আমি তাঁকে প্রসব করলাম। আমি তাঁকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট গেলাম। তিনি তাঁকে কোলে তুলে নেন। তার পর একটি খেজুর চেয়ে নিয়ে সেটি চিবিয়ে তাঁর মুখে লালা দেন। এভাবে সর্বপ্রথম তাঁর পেটে যে বস্তুটি প্রবেশ করল, তা ছিল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর লালা। আসমা (রা.) বলনে, তারপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে তাহনীক করেন, তাঁর জন্য দু'য়া করেন ও তাঁর জন্য বরকত কামনা করেন। কাজেই তিনি ইসলাম যুগে (মদীনায়) জন্মগ্রহনকারী প্রথম ব্যক্তি। (বুখারী, মুসলিম)

তিনি একজন মহান সাহাবী ছিলেন। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন, হাদীস বর্ণনা করেছেন তার পিতা উমর (রা.) থেকে, উসমান (রা.) প্রমুখ থেকে। আর তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন এক দল তাবিয়ী। তিনি কিশোর বয়সে পিতার সঙ্গে জামাল যুদ্ধে উপস্থিত হয়েছিলেন। হযরত উমর (রা.) জাবিয়ায় যে ভাষন দান করেছিলেন, তিনি তাতেও উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁর সেই ভাষন আনুপূর্বিক বর্ণনা করেছেন। এ তথ্যটি একাধিক

সূত্রে প্রমাণিত। তিনি কনস্টান্টিনোপাল যুদ্ধে অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে দামেশক গিয়েছিলেন। পরে আরো একবার সে দেশে গিয়েছিলেন। মু'আবিয়া ইবন ইয়াযিদ-এর মৃত্যুর পর ইয়াযিদ ইবন মু'য়াবিয়ার আমলে মানুষ তাঁর হাতে খিলাফতের বাই'আত গ্রহন করেন। তিনি হিজায, ইয়েমেন, ইরাক, মিশর, খোরাসান এবং দামেশক ব্যতীত সিরিয়ার সব ক'টি প্রদেশের শাসন ক্ষমতা লাভ করেন। ৬৪ হিজরীতে তাঁর বাই'আত গ্রহনের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়। তাঁর শাসনামলে মানুষ সুখ- শান্তিতে ছিল।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) এর ফযিলত

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে তাহনীক করেন, তাঁর নাম রাখেন আবদুল্লাহ এবং তাঁর জন্য দু'আ করেন। তাঁর জন্মে মুসলমানগণ আনন্দিত হন। কারণ, ইহুদীদের ধরণা ছিল যে, তারা মুহাজিরদেরকে যাদু করেছে, যার ফলে মদীনায় তাদের কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে না। এমতাবস্থায় যখন ইবন যুবাইর জন্ম লাভ করেন, মুসলমানগণ আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুললেন। তাকে হত্যা করার সময় সিরীয় বাহিনীকে তাকবীর ধ্বনি দিতে শুনে হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) বলেছিলেন, আল্লাহর শপথ! এই লোকটির ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর যারা তাকবীর ধ্বনি দিয়েছিল, তারা এদের তুলনায় উত্তম, যারা তাঁর খুন হওয়ার সময় তাকবীর ধ্বনি দিল। তাঁর জন্মের পর হযরত আবূ বকর (রা.) তাঁর কানে আযান দিয়েছিলেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার শিঙ্গা লাগিয়েছিলেন। এতে যে রক্ত বের হয়েছিল তা তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.)কে দিয়ে বললেন, আব্দুল্লাহ! এই রক্ত নিয়ে এমনভাবে ফেলে আস, যেন কেউ তোমাকে দেখতে না পায়। কিন্তু কতটুকু দূরে গিয়ে তিনি সে রক্ত পান করে ফেলেন। তিনি ফিরে আসলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, রক্ত কী করেছ? তিনি বললেন আমি তা পান করে ফেলেছি। এ উদ্দেশ্যে যাতে এর দ্বারা আমার ইলম ও ঈমান বৃদ্ধি পায়। আর যাতে আমার শরীরে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি অংশও থাকে। আর যমীনের তুলনায় আমার শরীরই তাঁর বেশী উপযুক্ত। তা শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি সুসংবাদ গ্রহন কর, আগুন কখনো তোমাকে স্পর্শ করবে না। আর তুমি মানুষের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং মানুষও তোমার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ৫৮৪)

হযরত উমর ইবন আব্দুল আযীয (রা.) একদিন ইবনে আবূ খুলাইফাকে বললেন, আমাকে আপনি আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) সম্পর্কে কিছু বলুন। ইবনে আবূ খুলাইফা বললেন, একদা মিনজানীক নিক্ষিপ্ত একটি পোড়া ইট তাঁর দাড়ি ও বুকের মধ্যখান দিয়ে অতিক্রম করে। কিন্তু তিনি ভয় পেলেন না, সে কারণে কুরআন তিলাওয়াতও বন্ধ করলেন না এবং যে নিয়মে রুকু করতেন, সেই নিয়মের ব্যতিক্রম করে রুকু করলেন না। তিনি যখন নামাযে প্রবেশ করতেন, তখন সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই তাতে প্রবেশ করতেন। তিনি যখন রুকু করতেন, তখন এমন হত, যেন শকুন এসে তার পিঠে পতিত হওয়ার উপক্রম হত। যখন সিজদা করতেন, তখন মনে হত, যেন তিনি একটি ফেলে রাখা কাপড়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কে হযরত ইবনে যুবাইর (রা.) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, তিনি আব্দুল্লাহর কিতাবের পাঠকারী, সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসারী, আল্লাহর অনুগত এবং আল্লাহর ভয়ে গরমের সময়ও রোযা পালনকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাওয়ারীর পুত্র। তাঁর মা হলেন আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এর কন্যা। আল্লাহর বন্ধুর প্রিয়পাত্র, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা.) তাঁর খালা। কাজেই আল্লাহ যাকে অন্ধ করে দিয়েছেন, এমন ব্যক্তি ছাড়া কেউ তাঁর মর্যাদা ভুলতে পারে না। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ৫৮৫)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) এক নাগাড়ে সাতদিন রোযা রাখতেন। তিনি এক শুক্রবার রোযা রাখতেন এবং পরবর্তী জুম'আর রাত না হওয়া পর্যন্ত আর ইফতার করতেন না।

কেউ কেউ বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) রমযান মাসের মঝামাঝি সময়ে একবার ব্যতীত আর আহার করতেন না। খালিদ ইবনে আবূ ইমরান বলেন, ইবনে যুবাইর (রা.) মাসের তিনদিন রোযাবিহীন অতিবাহিত করতেন।

প্রমাণ আছে যে, হযরত উসমান (রা.) তাঁকে যায়েদ ইবন সাবিত, সাঈদ ইবনুল আস ও আব্দুর রহমান ইবনুল হারিস ইবনে হিশাম (রা.) এর দলের অন্তর্ভুক্ত করেন, যারা পবিত্র কুরআনের কপি প্রস্তুত করেছেন। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ৫৮৬)

আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা.) কোনো খাবার না খেয়ে বেঁচে থাকার দলিল:

عن اسماء بنت يزيد رضي الله عنها في حديث الد جال قالت: قلت: يا رسول الله والله انا لنعجن عجينا فما نخبزه حتي نجوع فكيف بالمؤمنين يومئذ؟ قال: يجزيهم ما يجزى اهل السماء من التسبيح و التقدس.(روه احمد)

অনুবাদ: হযরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ (রা.) থেকে দাজ্জাল প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, (যাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জালের ফেতনা ও তার যুগে দুর্ভিক্ষের উল্লেখ করেছেন।) আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! কখনো আমরা আটার খামির করি। রান্নাকারী না পাওয়ার দরুন ক্ষুধা লেগে যায় (যাতে আমরা ক্ষুধায় কাতর হয়ে যাই।) তাহলে ওই দিন মুসলমানদের কী অবস্থা হবে (যখন তাদের বিরোধীদের দুর্ভিক্ষে পড়তে হবে।) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, মুসলমানদের জন্য ওই খাবারই যথেষ্ট হবে, যা আসমানওয়ালাদের জন্য হয়। অর্থাৎ তাসবীহ-তাহলীল। (মুসনদে আহমদ, খণ্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ৪৫৬)

এ হাদীস দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে, স্রেফ তাসবীহ ও যিকর-আযকার দ্বারাও খাবার চাহিদা পূরণ হয়।

ইমাম বুসীরী বলেন, এই হাদীসের অনুরূপ হযরত আয়েশা (রা.) এর থেকেও হাদীস রয়েছে। সুতরাং এ সনদকে এই কারণে হাসান লি গাইরিহি বলা হয়।

হযরত উসমান (রা.) এর নিরাপত্তায় আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা.):

'ইয়াউমুদ্দার' (উসমান হত্যার দিন) এ যারা হযরত উসমান (রা.) এর পক্ষে মোকাবিলা করেছিলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) তাদের একজন ছিলেন। সেদিন তিনি তেরটি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ৫৮৮)

আহলে বাইতবিদ্বেষী হাজ্জাজ বিন ইউসূফ আস সাক্বাফী

দেওবন্দের মুফতীয়ে আজম মুফতী শফী সাহেব তার 'কাশকুল' কিতাবে একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি নিম্নে পেশ করা হলো-

একদা হাজ্জাজ বিন ইউসূফের মজলিসে ইয়াহইয়া বিন মা'মার বসা ছিলেন। ঘটনাক্রমে ইমাম হুসাইন (রা.) এর আলোচনা আসল। তখন হাজ্জাজ বলতে লাগল হুসাইন (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সন্তান নন। (কেননা তিনি ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মেয়ের সন্তান। আর সন্তানের বংশ পরিচয় নানার দিক থেকে হয় না)। ইয়াহইয়া রাগান্বিত হয়ে বললেন, আপনি মিথ্যা বলেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সন্তান। এতে হাজ্জাজ অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে বলল, যদি তুমি নানার দিক থেকে বংশ পরিচয় সাব্যস্ত হওয়ার দলিল কুরআন থেকে পেশ করতে না পার তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করব। উত্তরে হযরত ইয়াহইয়া কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করলেন।

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى

অনুবাদ: এবং তাঁর বংশধর দাউদ, সুলাইমান, আইয়ুব, ইউসূফ, মূসা ও হারুনকেও; আর এইভাবেই সৎকর্মপরায়নদের পুরস্কৃত করি। এবং যাকারিয়া, ইয়াহয়া, ঈসা এবং ইলয়াসকেও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম।

ইমাম ইয়াহইয়া (র.) বললেন, উক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ঈসা (আ:) কে হযরত আদম (আ:) এর সন্তানের মধ্যে গণ্য করেছেন। অথচ আদম (আ.) ঈসা (আ.) এর নানা হবেন। কেননা তাঁর মায়ের মাধ্যমে তাঁর বংশ পরিচয়। হাজ্জাজ তার কথা মেনে নিতে বাধ্য হল। সে বলল, আমার সম্মুখে আমাকে মিথ্যারোপ করার সাহস তোমাকে কে দিল? হযরত ইয়াহইয়া বললেন, কুরআনের সূরা আন'আমের ৮৪ নং আয়াত আমাকে সাহস দিয়েছে। উক্ত আয়াতে নবীগণ ও তাঁদের অনুসারীদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে যে, তারা সত্য কথা গোপন করবে না। একথায় হাজ্জাজ নিরোত্তর হয়ে গেল। তবে হাজ্জাজ ইয়াহইয়াকে খোরাসানে নির্বাসনে পাঠাল। (ইবনে আসাকির, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৬৫, কাশকুল, পৃষ্ঠা: ৩২)

বনু উমাইয়ার গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসূফ কর্তৃক সাহাবায়ে কিরামের সাথে দুর্ব্যবহার

হাজ্জাজ যে সকল সাহাবীর সাথে দুর্ব্যবহার করেছিল তন্মধ্যে একজন হলেন হযরত আনাস বিন মালিক (রা.)। হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে তুলে ধরছি। বনু উমাইয়ার গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসূফ কর্তৃক সাহাবায়ে কিরামের সাথে দুর্ব্যবহারের বর্ণনা দিতে গিয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে আসির লিখেছেন-

فختم في عنقه وختم ايضا في عنق انس بن مالك ...... وختم في يد جابر بن عبد الله

يريد اذلا لهم بذالك وان يجتنبهم الناس ولايسمعون منهم–

অর্থাৎ হাজ্জাজ, সাহাল বিন সা'দ (রা.)-এর ঘাড়ে মহর লাগিয়ে দিয়েছে এবং হযরত আনাস (রা.) এর ঘাড়েও মহর লাগিয়ে দিয়েছিল। অনুরূপ সে জাবির বিন

আব্দুল্লাহ (রা.) এর হাতের মধ্যে মহর লাগিয়ে দিয়েছিল যাতে মানুষ তাদেরকে প্রত্যাখান করে এবং তাঁদের কথা না শুনে। (উসদুল গাবাহ, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৬৬)

হযরত আনাস (রা.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মদীনায় অবস্থানকালে দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত তাঁর খিদমত করেন। তার মা হলেন উম্মে সুলায়মান বিনতে মিলহান ইবনে খালিদ ইবনে যায়েদ ইবনে হারাম। এ মা-ই তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাতে তুলে দিয়েছিলেন এবং তিনি তা কবুল করেছিলেন। মা তার এ সন্তানের জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে দু'আর আবেদন করলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন- اللهم اكثر ماله وولده واطل عمره وادخله الجنة– "হে আল্লাহ! তাঁর ধন দৌলত ও সন্তান-সন্তুতি বাড়িয়ে দিন এবং তাকে দীর্ঘায়ু দান করুন এবং তাকে জান্নাতে দাখিল করুন।"

হযত আনাস (রা.) বলেন, এর দু'টি বিষয় আমি দেখেছি এবং তৃতীয়টির (জান্নাত প্রবেশ) প্রতীক্ষায় রয়েছি। আল্লাহর কসম! আমার অবশ্যই অধিক সম্পদ রয়েছে এবং আমার সন্তান ও সন্তানের সন্তান-সন্ততির সংখ্যা একশ ছাড়িয়ে গেছে। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, আমার আঙ্গুর বাগান বছরে দু'বার করে ফল দেয়। আর আমার ঔরসজাত সন্তানের সংখ্যা একশত ছয়জন।

বসরায় তিনি ইন্তিকাল করেন এবং সেখানে বিদ্যমান সাহাবীগণের মধ্যে তিনিই সর্বশেষ ব্যক্তি। এ তথ্য উল্লেখ করেছেন আলী ইবনুল মাদীনী (র:)। তার মৃত্যু হয়েছিল নব্বই হিজরীতে। মতান্তরে একানব্বই, বিরানব্বই ও তিরানব্বই হিজরীতে। তবে শেষ মতটি অধিক প্রসিদ্ধ এবং তা অধিকাংশের সমর্থিত। (আল-বিদায়া ওয়াল নিহায়া, খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৫৩৭)

আল্লামা দমিরী (র.) হায়াতুল হায়ওয়ান কিতাবে লিখেছেন, এই কাহিনী আলী বিন যায়েদ বিন জাদ'আন এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, একবার হযরত আনাস (রা.) হাজ্জাজ বিন ইউসূফ সাক্বাফীর নিকট গমন করলেন, সে নেহায়েত জালিম ও অত্যাচারী ছিল। এই বেআদব (হাজ্জাজ) তাঁকে দেখে অশালীন বাক্য উচ্চারণ করল- অথর্ব কোথাকার, বৃদ্ধ হয়েও অশান্তির আগুন জ্বালাচ্ছে কখনো আবু তুরাবের পক্ষ অবলম্বন করে, আবার কখনো ইবনে যুবাইরের দিকে ঝুঁকে পড়ে, আবার কখনো ইবনুল আশ'আসের নিশ্বাস ভরে নেয় এবং কখনো ইবনুল জারুফের গান গাইতে থাকে। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, কোন দিন আমি কুমিরের মতো তোমার চামড়া তুলে নেবো,' এভাবে তুলব, যেভাবে গাছের চামড়া তুলে নেয়া হয় এবং তোমাকে এভাবে প্রহার করব, যেভাবে কাঁটাযুক্ত গাছের পাতা ঝরিয়ে দেয়া হয়। এমন খারাপ মানুষের প্রতি- যে বখীল, মুনাফিক- আমি আশ্চর্য বোধ করি।"

হযরত আনাস (রা.) হাজ্জাজের এই অশালীন কথা শ্রবণ করে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এই কথা কাকে উদ্দেশ্য করে বলছেন? হাজ্জাজ নির্দ্বিধায় বলে উঠল- اياك اعني اصم الله صداك অর্থাৎ আমার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র তুমিই, আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন। (নাউজুবিল্লাহ)

হযরত আনাস (রা.) হাজ্জাজের দুর্ব্যহারের সংবাদ খলিফা আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের কাছে লিখে পাঠালেন। আব্দুল ম্যালিক মারওয়ানকে নির্দেশ দিলেন, আনাস (রা.) এর কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য। মারওয়ান তাকে তলব করলে তিনি উপস্থিত হয়ে বললেন, আপনি আমাকে দুষ্ট বলে সাব্যস্ত করেছেন, অথচ আল্লাহ পাক আমাদেরকে কুরআনুল কারীমে আনসার বলে অভিহিত করেছেন। আপনি আমাকে বখিল বলেছেন, অথচ আমরা সেই লোক যারা মদীনায় মুহাজিরীনদের আগমনের পূর্ব হতেই বসবাস করতেছি। আপনি নিজ ধারণায় আমাকে ইরাকীদের জন্য এই কাজের উপায় বানাতে চেয়েছেন যেন, তারা আপনার ঐ সকল কর্মকাণ্ডকে যা আল্লাহ পাকের নিকট হারাম, তা হালাল মনে করতে থাকে। অথচ আপনার এবং আমাদের মাঝে আল্লাহ পাকই বিচারক। তিনি নেক কাজে সন্তুষ্ট এবং মন্দ কাজে অসন্তুষ্ট। বান্দাহর শাস্তি ও পুরস্কার তাঁর হাতেই নিহিত। তিনি মন্দের বদলা মন্দের দ্বারা এবং পুণ্যের বদলা পুণ্যের দ্বারা প্রদান করেন। আল্লাহর শপথ! নাসারাগণ কাফির এবং মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও যদি এমন কোন ব্যক্তিকে দেখে, যে একদিনের জন্যও হযরত ঈসা (আ.) এর খিদমত করেছে, তবে তারা তাকে পর্যাপ্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করে থাকে। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমত দশ বৎসর করেছি। অথচ আপনি আমার এই খিদমতের কোন মূল্যই দেননি। আমরা আপনার দিক হতে কোন কল্যাণ না পাইলেও আমরা এর জন্য শোকর আদায় করব এবং যদি কোন অনিষ্ট আপতিত হয়, তাহলে এর উপর ধৈর্য ধারণ করব, যতক্ষন না আল্লাহ পাক আমাদের জন্য পরিত্রাণের উপায় সৃষ্টি করে দিবেন।

কেবল হাজ্জাজ নয়, বনু উমাইয়ার অধিকাংশ শাসক ও অনুসারীগণ আহলে বাইতকে ভালবাসার কারণে সাহাবীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত।

আনসারদের ফযিলতঃ হযরত আনাস (রা.) ছিলেন একজন আনসার সাহাবী। আনসারদের ফযিলত সম্পর্কে বুখারী শরীফ থেকে কয়েকটি হাদীস নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১. হযরত বারা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, মু'মিন ছাড়া আনসারগণকে কেউ ভালবাসবে না এবং মুনাফিক ছাড়া কেউ তাদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করবে না। যে

ব্যক্তি তাদেরকে ভালবাসবে, আল্লাহ তাকে ভালবাসবেন, যে ব্যক্তি তাদেরকে ঘৃণা করবে, আল্লাহ তাকে ঘৃণা করবেন। (বুখারী)

২. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আনসারদের প্রতি মুহাব্বত ঈমানেরই নির্দেশ এবং তাঁদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা মুনাফিকীর পরিচায়ক। (বুখারী)

৩. রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি আনসারগণের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখার জন্য তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি: কেননা তাঁরাই আমার অতি আপনজন, তারাই আমার বিশ্বস্ত লোক। তারা তাদের উপর আরোপিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পরিপূর্ণভাবে পালন করেছে। তাঁদের যা প্রাপ্য তা তারা এখনো পায়নি। তাঁদের নেক লোকদের উত্তম কার্যকলাপ সাদরে গ্রহণ করবে এবং তাঁদের ক্রটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করবে। (বুখারী)

রাসূল (সা.) এর শিখানো দু'আ পড়ে হযরত আনাস (রা.) হাজ্জাজের হাত থেকে রক্ষা পেলেন

একদা হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) হাজ্জাজের কাছে বসা ছিলেন। সে হযরত আনাস (রা.)কে তার বিভিন্ন ধরনের শখের ঘোড়া দেখাল। তার উদ্দেশ্য ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ঘোড়ার সাথে তার ঘোড়ার তুলনা করে অহংকার প্রদর্শন করা। হযরত আনাস (রা) তার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বললেন, তুমি যে উদ্দেশ্যে নিয়ে ঘোড়া প্রতিপালন করছ ইহা তোমার জন্য দোযখের কারণ হতে পারে। হাজ্জাজ কয়েকটি কারণ উল্লেখ করে বলল, উক্ত কারণগুলো না হলে আমি তোমাকে উচিত শিক্ষা দিতাম। হযরত আনাস (রা.) বললেন, আল্লাহর কসম! তুমি আমার কোন ক্ষতি করতে পরবে না। কারণ আমি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছ থেকে একটি দু'আ শিখে নিয়েছিলাম। আনাস (রা.) হাজ্জাজের ঘটনাটি ইমাম সুয়ূতী (র:) তার 'তারিখে জাআমি' কিতাবে এবং ইবনে আসির তার 'তারিখ'এ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। দু'আটি নিম্নরোপ-

بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰي نَفْسِي وَدِيْنِي بسم الله علي اهلي ومالي وولدي- بسم الله علي ما اعطاني الله الله ربي لا اشرك به شيئا الله اكبر- الله اكبر واعز واجل واعظم مما اخاف واحذر عز جارك وجل ثناوك ولا اله غيرك- اللهم اني اعوذبك من شر نفسي، ومن شر كل شيطان مريد، ومن شر كل جبار عنيد- فان تولوا حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولي الصالحين-

হযরত আনাস (রা.) এর দু'আর প্রেক্ষাপট:

শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র:) উক্ত দু'আটির ব্যাখ্যায় একটি পুস্তিকা লিখেছেন। পুস্তিকাটির নাম হলো الاستاس انوار القبس في شرح دعاء انس উক্ত পুস্তিকায় তিনি উপরোক্ত দু'আর প্রেক্ষাপট আলোচনা করতে একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি নিম্নরূপ: শেখ জালালুদ্দিন সুয়ূতী (র:) প্রখ্যাত হাফিযে হাদিস ছিলেন। তিনি তাঁর জমউল জাওয়ামি' কিতাবে লিখেছেন, শায়খ তাঁর কিতাবুস সওয়াবে এবং ইবনে আসাকির তার তারিখে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। একদিন হযরত আনাস (রা.) হাজ্জাজ বিন ইউসূফ সাক্বাফীর দরবারে বসা ছিলেন। সে তাঁর কর্মচারীদেরকে নির্দেশ দিল, তারা যেন বিভিন্ন ধরনের চারশত ঘোড়া তার সামনে প্রদর্শন করে। কর্মচারীরা তাই করল। হাজ্জাজ হযরত আনাস (রা.)কে বলল, বলুনতো আপনার মনিব অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এ ধরনের ঘোড়া ও আত্মপ্রসাদের সামগ্রী কি দেখেছেন? হযরত আনাস (রা.) বললেন, আল্লাহর কসম! এর চাইতে অনেক উত্তম সামগ্রী দেখেছি। আমি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, মানুষ তিন ধরনের ঘোড়া পালন করে থাকে। কেউ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে পালন করে যার দ্বারা বীরত্ব প্রর্দশন করে থাকে। এ ধরনের ঘোড়ার প্রস্রাব, গোবর , গোশত, রক্ত তার আমলের পাল্লায় ওজন করা হবে। দ্বিতীয় ধরনের ঘোড়া নিজের প্রয়োজনীয় কাজের জন্য পলন করা হয়। তৃতীয় ধরনের ঘোড়া নিজের নাম প্রসারের জন্য পালন করা হয়। এই মানসিকতায় পালন করে থাকে যে, লোকেরা দেখে বলবে অমুকের কাছে ভালো ভালো ঘোড়া বিদ্যমান আছে। এদের ঠিকানা হচ্ছে দোযখ। হযরত আনাস (রা.) বললেন, হাজ্জাজ তোমার ঘোড়াগুলি তৃতীয় ধরনের অন্তর্ভুক্ত। ইহা শুনে হাজ্জাজ ক্রোধে অগ্নিশর্মা হল এবং বলল, হে আনাস! তুমি যদি আল্লাহর রাসূলের খাদিম না হতে আর আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান আমাকে তোমার সাথে সদাচারনের জন্য চিঠি না দিতেন, তাহলে তোমাকে এমন শাস্তি দিতাম যা বলার মত নয়। হযরত আনাস (রা.) বললেন তুমি আমার কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। এমনকি আমাকে রক্ত চক্ষুও দেখাতে পারবে না। আমি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে কয়েকটি বাক্য শিখেছি, যা পাঠ করে আমি নিরাপদে থাকি। কোন বাদশাহ অথবা শয়তানের অনিষ্টের ভয় করি না। তা শুনে হাজ্জাজ ঘাবড়ে গেল। কিছু সময় পর বলল, আমাকেও এ দু'আটি শিখিয়ে দাও। তিনি বললেন, আমি তোমাকে কখনো শিখাব না। কেননা তুমি এর যোগ্য নও। (আল-ইসতিনাস)

হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা.)-কে হাজ্জাজের মানসিক নির্যাতন

মারওয়ান যেভাবে আহলে বাইতসহ অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামদের মানসিক নির্যাতন করার উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফের মিম্বরে বসে আলী (রা.) কে গালি-গালাজ করত। অনুরূপ হাজ্জাজ হযরত হযরত আসমা (রা.)কে মানসিক নির্যাতন করার উদ্দেশ্যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.)কে হত্যা করার পর তাঁর সম্মুখে তাঁকে গালমন্দ করে। এ প্রসঙ্গে হাফিয ইমাদ উদ্দিন ইবনে কসীর-এর আল বিদায়া ওয়ান নেহায়া কিতাব থেকে কিছু আলোচনা তুলে ধরা হলো।

তারপর হাজ্জাজ তাঁর মাতা আসমা বিনত আবু বকর (রা.)কে ডেকে পাঠালো। কিন্তু আসমা (রা.) যেতে অস্বীকার করেন। হাজ্জাজ পুনরায় তাঁর নিকট দূত প্রেরণ করে যে, আপনি হয় আমার নিকট আসুন, অন্যথায় আমি এমন ব্যক্তিকে প্রেরণ করব যে আপনার মাথার ঝুঁটি ধরে আপনাকে আমার নিকট টেনে নিয়ে আসবে। কিন্তু আসমা (রা.) এবারও অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি তার নিকট যাব না। সে লোক পাঠিয়ে ঝুঁটি ধরে আমাকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাক। এ কথা শুনে হাজ্জাজ বলল, আমার জুতা জোড়া এনে দাও। জুতা জোড়া পায়ে দিয়ে দম্ভভরে চলতে শুরু করল। আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.)-এর মা আসমা বিনত আবু বকর (রা.) এর নিকট গিয়ে বলল, আমি আল্লাহর দুশমনটার সঙ্গে যে আচরণ করলাম, আপনার দৃষ্টিতে তা কেমন হল? আসমা (রা.) বললেন, আমার দৃষ্টিতে তাঁর নষ্ট হয়েছে দুনিয়া; আর তুমি ধ্বংস করেছ নিজের আখিরাত। আমি জানতে পেরেছি তুমি তাঁকে 'যে যাতুন নিতাকাইন' এর পুত্র বলে ডাকতে। আল্লাহর শপথ! আমি যাতুন নিতাকাইনই বটে। একটি হল যাতে করে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর (রা.) এর খাবার বহন করতাম। অপরটি হল, মহিলাদের দেহের নিম্নাংশে পরিধেয় সেই বস্ত্রখণ্ড যা ছাড়া কোন নারীই চলতে পারে না। শোন! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন, সাক্বীফ গোত্রে একজন মিথ্যাবাদী ও একজন অত্যাচারীর আবির্ভাব ঘটবে। মিথ্যাবাদীকে তো আমরা দেখেছি। আর অত্যাচারী-সে তো তুমি ছাড়া কেউ নয়। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ৩৯২)

আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) এর সাথে হাজ্জাজের দুর্ব্যবহারের একটি কারণ রয়েছে। কারণটি হলো, প্রকৃত পক্ষে সে মুমিন ছিল না। আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি (র.) তার বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফয়যুল বারী কিতাবে বলেছেন, ইমাম আহমদ (র.) থেকে একটি বর্ণনা আছে যে, তিনি হাজ্জাজের উপর কুফুরী ফতোয়া দিয়েছেন যেভাবে ইয়াযীদের উপর কুফুরী ফতোয়া দিয়েছেন। তিরমীযি শরীফে আছে হাজ্জাজ এক লক্ষ চব্বিশ হাজার সাহাবী ও তাবেঈকে হত্যা করেছে। (ফয়যুল বারী: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৮)

হাজ্জাজের এ দুর্ব্যবহারের ৭৩ বছর আগে এ উম্মতের ফেরাউন আবু জেহেল হযরত আসমা (রা.) এর সাথে দুর্ব্যবহার করেছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হিজরতের উদ্দেশ্যে আবু বকর (রা.) এর ঘর থেকে বের হয়ে যান তখন আবু জেহেল আবু বকর (রা.) এর ঘরে এসে আসমা (রা.) এর সাথে দুর্ব্যবহার করেছিল। প্রমান স্বরূপ নিম্নে বিদায়া ওয়ান নিহায়া কিতাব থেকে কিছু আলোচনা তুলে ধরা হলো।

ইবনে ইসহাক বলেন: হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) সন্ধ্যায় তাঁদের জন্য যথোপযুক্ত খাদ্য নিয়ে আসতেন। এ প্রসঙ্গে আসমা (রা.) বলেন: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বকর (রা.) বের হওয়ার পর কুরাইশের একদল লোক আমাদের নিকট আসে। তাদের মধ্যে আবু জেহেল ইবনে হিশামও ছিল। তারা এসে আবু বকর (রা.) এর ঘরের দরজায় দাঁড়ালে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। তারা জিজ্ঞেস করল, হে আবু বকর তনয়া! তোমার পিতা কোথায়? তিনি বর্ণনা করেন যে, আমি বললাম, আল্লাহর কসম, আব্বা কোথায় আছেন আমার জানা নেই। হযরত আসমা (রা.) বলেন, (এ কথা শ্রবণ করার পর) আবু জেহেল- আর সে ছিল খবীস বজ্জাত- হাত উঠিয়ে সজোরে আমার মুখে এমন এক চপেটাঘাত করে যে, তাতে আমার কানের বালি (দুল) পড়ে যায়। তার পর তারা চলে যায়। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড:৩, পৃষ্ঠা: ৩২৮)

উল্লেখ্য: হাজ্জাজের ব্যবহারকে আবু জেহেলের ব্যবহারের সাথে তুলনা করা যায়। হযরত আসমা (রা.) কে 'যাতুন নেতাকাইন' বলার কারণ হযরত আবু বকর (রা.) এর বড় মেয়ে হযরত আসমা (রা.) সফরের জন্য নাস্তা তৈরী করেন। তাড়াহুড়ার কারণে রশি ব্যতিরেকে স্বীয় কোমরবন্দ ছিড়ে নাস্তার পাত্র বাধেঁন। সেদিন থেকে হযরত আসমা (রা.) 'যাতুন নেতাকাইন' অর্থাৎ দুই কোমরবন্দ বিশিষ্ট নামে খ্যাত হন। ইবনে সা'দের রেওয়ায়াতে বর্ণিত যে, কোমরবন্দ এর একটি অংশ দিয়ে রসদ পত্র আর এক অংশ দিয়ে চামড়ার পানপাত্রের মুখ বন্ধ করেন। (তাবাকাতে ইবনে সা'দ: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১৩৪)

ইয়াযিদ নাজাতপ্রাপ্ত না হওয়া সম্পর্কে শাহ ওলিউল্লাহ (র.) -এর বক্তব্য

ঘটনা ক্রমে কোন মুনাফিক মুসলমানদের সঙ্গী হয়ে জিহাদে শরীক হলে তাকে জান্নাতী বলা যাবে না। প্রমাণ স্বরূপ বুখারী শরীফের একটি হাদিস উল্লেখ করছি। কোন এক যুদ্ধে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে কাফিরদের মোকাবিল হয়, তখন 'কাযমান' নামক এক ব্যক্তি সাহাবীদের সেনাবাহিনীর

অর্ন্তভুক্ত ছিল। সে ছিল মুনাফিক। সে এ যুদ্ধে মুশরিকদের সাথে প্রাণপণ যুদ্ধ করে খুবই যশ ও খ্যাতি প্রদর্শন করেছিল। তখন হযরত সাহল ইবনে সা'দ সাঈদী নামক একজন সাহাবী বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! আজ আমাদের মধ্যে অমুক ব্যক্তি যেরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করেছে, অন্য কেউ অনুরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করেনি।' নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা শুনে ইরশাদ করেন- 'শুনে রাখ! সে তো জাহান্নামি।' পরিশেষে ঐ ব্যক্তি কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে মারাত্মকভাবে আহত হয় এবং আহত হওয়ার কষ্ট সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করে।

হাফিয আসকালানী (র.) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, এ হাদীসের শিরোনামের সাথে এই সামঞ্জস্য রয়েছে যে, ঐ ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার জন্য যুদ্ধ করেনি; বরং জাতীয় ও গোত্রীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করেছে। তাই এধরনের ব্যক্তিকে শহীদ বলা যায় না। (সীরাতে মুস্তফা, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২৪-২৫)

নজদী ওয়াহাবীদের দ্বারা প্রভাবিত কিছু সংখ্যক আলিম ইয়াযিদের ফযীলত বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে কনস্টানিনোপলের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের জন্য রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ভবিষ্যত বাণীকে ইয়াযিদের ব্যাপারে প্রযোজ্য বলতে চায়। অথচ বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'ফতহুল বারী' ও 'উমদাতুল কারী' এবং শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র:) এর শরহে তারাজিমে আবওয়াবে বুখারী' কিতাবসমূহে ইয়াযিদকে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ সুসংবাদের অন্তর্ভূক্ত ছিল না বলে মত প্রকাশ করেছেন। বিস্তারিত জানতে হলে 'উমদাতুল কারী' খণ্ড: ১২, পৃষ্ঠা: ১০-১১, ফতহুল বারী-খণ্ড: ১০, পৃষ্ঠা: ৭৪ দেখুন।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) 'শরহে তারাজিমে আবওয়াবে বুখারী' কিতাবে লেখেন-

قوله مغفور لهم تمسك بعض الناس بهذا الحديث في نجاة يزيد لانه
كان من جملة هذا الجيش الثاني بل كان رأسهم ورئيسهم على ما يشهد به التواريخ
والصحيح انه لا يثبت بهذا الحديث الا كونه مغفورا له ما تقدم من ذنبه
على هذه الغزوة لان الجهاد من الكفارات وشان الكفارات ازالة آثار
الذنوب السابقة عليها لا الواقعة بعدها نعم لو كان مع هذا الكلام انه مغفور له
الى يوم القيمة يدل على نجاته وليس فليس بل امره مفوض الى الله تعالى فيما ارتكبه
من القبائح بعد هذه الغزوة من قتل الحسين عليه السلام وتخريب المدينة
والاصرار على شرب الخمر ان شاء عفا عنه وان شاء عذبه كما هو مطرد في حق

ـاثر السعات على ان الاحاديث الواردة في شان من استخف بالعترة الطاهرة و الملحد في الحرم و المبدل للسـنة تبق مخصصات لهـذا العموم لو فرض شموله بجميع الذنوب .

অনুবাদ: রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী (তাঁরা নাজাতপ্রাপ্ত): কিছু লোক এটা দিয়ে ইয়াযিদ এর নাজাতের সপক্ষে দলিল দেয়। কারণ ইতিহাস গ্রন্থাদির সাক্ষ্য অনুসারে সে এ দ্বিতীয় দলের অর্ন্তভুক্ত ছিল। এমনকি সে তাদের নেতা ও সেনাপতি ছিল। আসলে এ হাদীস দ্বারা যুদ্ধের আগে করা তার অপরাধগুলো ছাড়া অন্য কিছু মাফ হওয়া সাব্যস্ত হয় না। কারণ জিহাদ কাফফারার অর্ন্তভুক্ত। আর কাফফারার রীতি হলো পূর্বের গুনাহ দূর করা, ভবিষ্যতে ঘটিতব্য বিষয়গুলো নয়। হ্যাঁ, যদি হাদীসে এমন বলা হতো যে, সে কিয়ামত পর্যন্ত ক্ষমাপ্রাপ্ত, তাহলে তার নাজাত বুঝা যেত। তা তো কখনো বলা হয়নি। তাই এ যুদ্ধের পর হযরত হুসাইন (রা.) কে হত্যা, মদীনা ধ্বংস করা, মদ পানের সাথে লেগে থাকা ইত্যাদি যেসব কাজ ইয়াযিদ করেছে, সেসব আল্লাহর কাছে ন্যস্ত থাকবে। অন্যান্য পাপীদের ব্যাপারে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তিনি চাইলে তাকে ক্ষমা করবেন অথবা চাইলে শাস্তি দিবেন। এর পরও পবিত্র আহলে বাইতের অবমাননাকারী, হারামে সীমালঙ্ঘনকারী, সুন্নাতে পরিবর্তনকারী সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস উপরোক্ত সাধারণ বক্তব্যকে খাস করার জন্য তো রয়েছেই। (শরহে তারাজিমে আবওয়াবে বুখারী, পৃষ্ঠা: ৩১-৩২)

প্রকাশ থাকে যে, শাহ ওয়লীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র:) উপরোক্ত ব্যাখ্যায় হযরত হুসাইন (রা.) কে হত্যা, মদীনা ধ্বংস করা, মদ পানের সাথে লেগে থাকা ইত্যাদি কাজের সম্বন্ধ ইয়াযিদের দিকেই করেছেন। আর ইয়াযিদপন্থীরা তাকে উক্ত অপরাধগুলো থেকে মুক্ত রাখার অপচেষ্টা করছেন। যে সকল আলিম বুখারী শরীফের উপরোক্ত হাদীসের অপব্যাখ্যা দ্বারা ছাত্রদেরকে পথভ্রষ্ট করছেন, তাদের মাসনাদুল হিন্দ শাহ ওয়লীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র:) এর ব্যাখ্যাটি পড়ে নেয়া উচিত।

হযরত মু'আবিয়া বিন ইয়াযিদ বিন মু'আবিয়া-এর খিলাফতকালিন সময়ের ভাষন

মু'আবিয়া ইবনে ইয়াযিদ ইবনে মু'আবিয়া সর্ম্পকে হাফিয ইমাদ উদ্দিন ইবনে কাসির এর আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া কিতাব থেকে কিছু আলোচনা তুলে ধরা হলো। তাঁর নাম ছিল মু'আবিয়া আল কুরাইশী আল উমরী। তাঁর কুনীয়াত ছিল

আবু আব্দুর রহমান, কেউ কেউ বলেন, আবু ইয়াযীদ। আবার কেউ কেউ বলেন, আবু ইয়া'লা। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর ৬৪ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসের ১৪ তারিখ তার হাতে বাইআত গ্রহন করা হয়। আর তিনি তাঁর পিতার পরে পূর্ব থেকে খলীফা মনোনীত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন, একজন পরহেজগার ও সৎ ব্যক্তি কিন্তু তার রাজত্ব দীর্ঘকাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়নি। তাকে দামেশকের বাবুস সাগীর নামক স্থানের কবরস্থানে দাফন করা হয়। যখন তার মৃত্যু আসন্ন তখন তাকে বলা হয়, তুমি কি ওসীয়ত করবে না ? তখন তিনি বলেন, আমি দুনিয়ার তিক্ততাকে পাথেয় হিসাবে আখিরাতে নিয়ে যাচ্ছি না। দুনিয়ার স্বাদ আমি বনু উমাইয়ার জন্য রেখে যাচ্ছি। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া)

ইয়াযিদের মৃত্যুর পর তার পুত্র মু'আবিয়া সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি তার পিতার তুলনায় অধিক ভালো ছিলেন। দ্বীনদারী এবং বিবেকবান উভয় গুণের অধিকারী ছিলেন। যেদিন তার পিতার ইন্তিকাল হয় সেদিনই তার নিকট হতে বাইআত নেওয়া হয়। মু'আবিয়া ইবনে ইয়াযিদ ৪০ দিন মসনদে ছিলেন। এর পর ইচ্ছা করেই পদত্যাগ করেন। পদত্যাগের সময় তিনি যে ভাষন দিয়েছিলেন তা নিম্নরূপ-

معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ثم قام بالأمر بع ده ابنه معاوية، وكان خيراً من أبيه. فيه عين وعقل، بويع له بالخلافه يوم موت أبيه. فاقام فيها أربعين يوما. وقيل أقام فيها خمسة أشهر وأياما. وخلع نفسه وذكر غير واحد، أن معاوية بن يزيد لما خلع نفسه صعد المنبر فجلس طويلا. ثم حمد الله وأثنى عليه بأبلغ ما يكون من الحمد والثناء، ثم ذكر النبي !. بأحسن ما يذكر به. ثم قال: يا أيها الناس، ما أنا بالراغب في الائتمار عليكم، لعظيم ما أكرهه منكم. وإني لأعلم أنكم تكرهوننا أيضاً لأنا بلينا بكم وبليتم بنا، إلا أن جدي معاوية رضي الله تعالى عنه. قد نازع في هذا الأمر من كان أولى به منه، ومن غيره لقرابته من رسول الله !. وعظم فضله وسابقته. أعظم المهاجرين قدرا، وأشجعهم قلبا، وأكثرهم علما وأولهم إيمانا، وأشرفهم منزلة. وأقدمهم صحبة، ابن عم رسول الله ص!. وصهره وأخوه. زوجه عليه ابنته فاطمة، وجعله لها بعلا باختياره لها، وجعلها له زوجة باختيارها له. أبو سبطيه سيدي شباب أهل الجنة وأفضل هذه الأمة تربية الرسول وابني فاطمة البتول. من الشجرة الطيبة الطاهرة الزكية. فركب جدي معه ما تعلمون، وركبتم معه ما لا تجهلون، حتى انتظمت لجدي الأمور. فلما جاءه القدر المحتوم، واخترمته أيدي المنون. بقي مرتهنا بعمله، فريدا في قبره، ووجد ما قدمت يداه، ورأى ما ارتكبه واعتداه،

ثم انتقلت الخلافة إلى يزيد) بي فتقلد أمركم لهوى كان أبوه فيه، ولقد كان أبي يزيدبسوءفعله وإسرافه على نفسه، غيرخليق بالخلافة على أمة محمد صى. فركب هواه واستحسن خطاه، وأقحم على ما أقسم من جراءته على الله. وبغيه على من استحل حرمته، من أولاد رسول الله مح!مر، فقلت مدته وانقطع أثره، وضاجع عمله، رصار حليف حفرته رهين خطيئته، وبقيت أوزاره وتبعاته، وحصل على ما قم ونم حيث لا ينفعه الندم، وشغلنا الحزن له، عن الحزن عليه، فليت شعري ماذا قال وماذا قيل له هل عوقب باساءته. وجوزي بعمله وذلك ظني ثم اختنقته العبرة، فبكى طويلا وعلا نحيبه، ثم قال: وصرت أنا ثالث القوم والساخط علي أكزمن الراضي، وما كنت لأتحمل آثامكم ولا يراني الله جفت فحرته متقلدا أوزاركم، وألقاه بتبعاتكم. فشأنكم أمركم فخذوه، ومن رضيتم به عليكم فولوه، فلقد خلعت بيعتي من أعناقكم والسلام.

অনুবাদ: (বিজ্ঞ উলামায়ে কিরাম লিখেছেন: যখন তিনি স্বেচ্ছায় মসনদ ত্যাগ করেন, মিম্বরে আরোহন করে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত চুপ করে বসে থাকেন। তারপর উত্তম ভাবে হামদ ও সানা এবং দুরুদ শরীফ পাঠ করার পর বললেন, হে লোক সকল! রাজত্ব ও খেলাফতের ইচ্ছা আমার নেই। কেননা, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। তদুপরি আপনারা আমার প্রতিও সন্তুষ্ট নন। আমরা এবং আপনারা একে অপরকে বহুবার পরীক্ষা করেছি। কিন্তু ভাগ্যে যা ঘটবার তা ঘটবেই। আমার দাদা মু'আবিয়া (রা.) আগ বেড়েই ঝগড়া করেছেন। আসলে খিলাফতের অধিকারী কে? ঝগড়া কার সাথে করেছেন! যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অতি নিকট আত্মীয়, মান-মর্যাদা এবং ইসলামে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কারণে অভিজাত মুহাজিরীনদের মধ্যে সবচাইতে সাহসী বীর, অত্যন্ত জ্ঞানী ও ভদ্র, রাসুল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চাচাতো ভাই ও জামাতা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ছোট কন্যা ফাতিমা (রা.)'র স্বামী হিসেবে যাকে নির্বাচিত করেছেন। এই উম্মতের যুবকদের মধ্যে সবচাইতে শ্রেষ্ঠ এবং জান্নাতি যুবকদের সরদার হযরত হাসান ও হোসাইন (রা.)-এর শ্রদ্ধেয় পিতা ছিলেন।

আপনারা সম্যক অবগত আছেন যে, আমার দাদা মু'আবিয়া (রা.) এমন ব্যক্তির ব্যাপারেও বিরোধিতা করেছেন আর আপনারাও তাঁকে সঙ্গ দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত আমার দাদা সমগ্র মুসলিম জাহানের মালিক হয়ে গেলেন। কিন্তু নির্ধারিত সময় যখন হলো, মৃত্যু তাকে গ্রাস করে ফেলল। আর তিনি তার কর্ম নিয়ে কবরে চলে গেলেন। কবরে তাঁকে একাই দাফন করা হয়েছে। তিনি যা করেছেন এর

প্রতিফল তিনি পেয়েছেন। এর পর খিলাফত আমার পিতা ইয়াযিদের হাতে আসল। তিনিও তোমাদের কার্যাবলিকে সাজিয়ে দিলেন। তিনি তার পাপের ও অনর্থক ব্যয়ের কারনে খিলাফতের মোটেও উপযুক্ত ছিলেন না। তিনি জৈবিক চাহিদায় ডুবে গিয়েছিলেন। পাপের দায়-দায়িত্ব নিয়েছিলেন। আল্লাহর হুকুমের তোয়াক্কা করতেন না। যে কেউ আওলাদে রাসুলের সম্মান করত, তিনি তার পিছু লেগে যেতেন। তিনি শেষ কর্মে উপনীত হলেন। মৃত্যু এসে তাকে নিয়ে গেল। তার কর্ম নিয়ে তিনি জগত হতে বিদায় নিয়েছেন। কবরের বন্ধু হয়ে গেছেন। বদ আমলে ধরা পড়েছেন। নিজেই নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছেন। তিনি যা করেছেন তার প্রতিফল পেয়ে গেছেন। অতঃপর আমরাও তাঁর দুঃখ-বেদনার অংশিদার হলাম। আফসোস! তারা যা বলেছেন ও করেছেন এবং তার ব্যাপারে যা কিছু বলা যায়, ব্যাখ্যা করা যায়। এখন সময় এসেছে, তারা যা কিছু করেছেন তার জন্য তাদেরকে শাস্তি দেওয়া যাবে কি? না প্রতিদান দেওয়া হবে তা আমার জানা নেই। এটা আমার ধারনা মাত্র। এরপর লজ্জা তাকে গলা চেপে ধরল অর্থাৎ তিনি নির্বাক হয়ে গেলেন।

এর পর হযরত মু'আবিয়া ইবনে ইয়াযিদ দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত কাঁদলেন, উপস্থিত লোকজনও কাঁদলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি আবার বললেন, "এখন আমি ৩য় শাসক, যার উপর অনাস্থা পোষনকারী লোক বেশী। আমি তোমাদের বোঝা বহন করতে অক্ষম। আর না আল্লাহ তাআলা আমাকে এই জ্ঞান দান করেছেন, না আমি তোমাদের খেলাফতের উপযুক্ত ছিলাম, না আমি তোমাদের ভারি আমানতের হকদার। তোমাদের খেলাফতের আমানত একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। তোমরা এর হেফাযত কর এবং যাকে উপযুক্ত মনে কর এই আমানত সোপর্দ কর। আমি তোমাদের খিলাফতের দায়িত্ব আমার ঘাড় হতে নামিয়ে দিলাম। এখন আমি দায়িত্বমুক্ত। (হায়াতুল হায়ওয়ান)

যিয়াদ বিন সুমাইয়ার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

যিয়াদ বিন সুমাইয়ার চক্রান্তে হযরত হুজুর বিন আদী (রা.) এর মত জলীলুল কদর সাহাবী হযরত মু'আবিয়া (রা.) কর্তৃক শহীদ হন। কে সেই যিয়াদ বিন সুমাইয়া? নিম্নে যিয়াদ বিন সুমাইয়া সম্পর্কে মুফতি আমিমুল ইহসান (র.)-এর লিখিত তারিখে ইসলাম কিতাব থেকে কিছু আলোচনা তুলে ধরছি।

তিনি লেখেন- যিয়াদ ছিলো হারিস বিন কালদা সাক্বাফীর দাসী সুমাইয়ার সন্তান। তাকে যিয়াদ বিন সুমাইয়া (সুমাইয়ার পুত্র) বা যিয়াদ বিন আবিহি (তার পিতার

পুত্র) বলা হতো। যেহেতু তার বৈধ পিতার পরিচয় ছিল না এজন্য তাকে মায়ের দিকে কিংবা অজানা পিতার দিকে সম্বন্ধ করা হতো। এটা তার জন্য লজ্জাজনক ছিল। তবে আমির মু'য়াবিয়া (রা.) এর জানা ছিলো যে জাহিলী যুগে তার পিতা আবু সুফিয়ানের সুমাইয়ার সাথে অবৈধ সম্পর্ক ছিল যার দ্বারা যিয়াদের জন্ম হয়। তবে আবু সুফিয়ান এটা কখনো স্বীকার করেননি। যদি তিনি স্বীকার করতেন তবে জাহিলী যুগের রীতি অনুযায়ী তাকে আবু সুফিয়ানের সন্তানই বলা হতো। ইসলাম এমন রীতিকে বাতিল করে দেয়। আমির মু'য়াবিয়া (রা.) ইবনে যিয়াদকে স্বপক্ষে নিয়ে আসার জন্য ভাইয়ের স্বীকৃতি প্রদান করেন। এতে তাঁকে স্বপক্ষে আনতে সফল হন। (তারিখে ইসলাম)

যদিও এটা নিয়ে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে বিতর্ক ছিলো। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে অন্যকে নিজের পিতা বলে দাবী করে অথচ সে জানে যে, সে তার পিতা নয়, জান্নাত তার জন্য হারাম। (বুখারী)

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় ইবনে হাজার আসকালানী (র.) 'ফাতহুল বারী' কিতাবে লেখেন– অনেক সাহাবী ও তাবিয়ী মু'য়াবিয়া (রা.) এর এ কাজকে অপছন্দ করতেন।(ফাতহুল বারী, খণ্ড: ১২, পৃষ্ঠা: ৪৬)

৪৪ হিজরীতে যিয়াদ বিন আবু সুফিয়ান পরিচয়ে সে হযরত মু'য়াবিয়া (রা.) এর পক্ষাবলম্বন করে। ৪৫ হিজরীতে সে বসরার গভর্ণর নিযুক্ত হয়। বসরায় সে অত্যাচারী শাসকের রূপ ধারণ করে। হাজারো নির্দোষ মানুষকে হত্যা করে। ৫০ হিজরীতে হযতে মুগিরা ইবনে শু'বা (রা.) এর ইন্তিকালের পর সে কুফার শাসন ভার গ্রহন করে। তার চক্রান্তেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হুজর বিন আদী (রা.) মু'য়াবিয়া (রা.)-এর চক্রান্তে পরিনত হন, এমনকি তাঁকে নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করতে হয়। ইমাম হাকিম তাঁর মুস্তাদরাক কিতাবে হযরত হুজর বিন আদী (রা.)কে রাহিবু আসহাবীন্নাবী উপাধী দান করেছেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে মুফতি আমিমুল ইহসান মুজাদ্দিদী (র.)-এর তারিখে ইসলাম দেখতে পারেন।

উপরের আলোচনার সমর্থনে ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (র.) এর 'ফতহুল বারী' (খণ্ড: ১২; পৃষ্ঠা ৪৬) কিতাব থেকে কিছু আলোচনা তুলে ধরলাম।

عن أبي عثمان قال لما ادعى زياد لقيت أبا بكرة فقلت ما هذا الذي صنعتم إني سمعت سعد بن أبيوقاص يقول فذكر الحديث مرفوعا فقال أبو بكرة وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد بزياد الذي ادعى زياد بن سمية وهي أمه كانت أمة للحارث بن كلدة زوجها المولى عبيد فأتت بزياد على فراشه وهم بالطائف قبل أن يسلم أهل

الطائف فلما كان في خلافة عمسمع أبو سفيان بن حرب كلام زياد عند عمر وكان بليغا فاعجبه فقال إني لاعرف من وضعه في أمه ولو شئت لسميته ولكن أخاف من عمر فلما ولى معاوية الخلافة كان زياد على فارس من قبل علي فاراد مداراته فاطمعه في أن يلحقه بأبي سفيان فأصغى زياد إلى ذلك فجرت في ذلك خطوب إلى أن ادعاه معاوية وأمره على البصرة ثم على الكوفة وأكرمه وسار زياد سيرته المشهورة وسياسته المذكورة فكان كثير من الصحابة والتابعين ينكرون ذلك على معاوية محتجين بحديث الولد للفراش

মারওয়ানের অপকর্ম সম্পর্কে কিছু আলোচনা

হযরত উসমান (রা.)-এর শাসনামল থেকে ইসলামের ইতিহাসে যে সকল অনাকাঙ্খিত ঘটনা বনু উমাইয়ার দ্বারা সংঘঠিত হয়, সে সকল ঘটনার পিছনে মারওয়ান ইবনে হাকামের পত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। ইসলামের ইতিহাসকে কলংকিত করা এ দুস্কৃতিকারীর কিছু কৃতকর্ম আহমদ রেজা বিজনুরী কৃত বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ যা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (র.)-এর বক্তব্যের সংকলন- 'আনোয়ারুল বারী' কিতাব থেকে তুলে ধরছি।

এখানে মারওয়ানের যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, তা সে সময়কার, যখন সে হযরত মু'আবিয়া (রা.) কর্তৃক নিয়োজিত মদীনার গভর্নর ছিল। হযরত শাহ ছাহেব (আনওয়ার শাহ কাশমিরী) বলেন, মারওয়ান ইমাম বুখারী (র.)-এর রিজালগণের একজন। সে খুবই ফিতনাবাজ ছিল। সাহবীদেরকে হত্যা করেছিল। কেবল আলী (রা.)-কে গালাগালি করার জন্য নামাযের পূর্বে লোকজনকে তা শুনানোর জন্য খুতবাহ প্রদান করত।

পাক-ভারতে এক সময় 'খেলাফত ও মুলুকিয়ত' খুবই গুরুত্বের সাথে আলোচিত হত এবং এসব আলোচনায় ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস ও তৎকালীন শাসক ও হাদীস বর্ণনাকারীদের আলোচনা চলে আসত। যেহেতু কয়েক শতাব্দী যাবত ইসলামের ইতিহাসকে ভুল ও পরিবর্তন করে ইউরোপের ইসলাম বিদ্বেষীরা উপস্থাপন করে আসছে। এতে আমাদের অনেক বড় বড় লোকও প্রভাবিত হয়েছেন। উদাহরন স্বরূপ শায়খ মো. আব্দুহ, আল্লামা রশিদ রেযা আল খিদরী (মুহাদারাত গ্রন্থাকার), আব্দুল ওয়াহাব নাজ্জার প্রমূখ। এজন্য এটাকে প্রত্যাখ্যান করা এবং সঠিক অবস্থার প্রতি আলোকপাত করা উলামায়ে উম্মত-এর প্রতি আবশ্যক হয়ে পড়ে। আল্লাহর শুকরিয়া, এ কাজের জন্য 'মাদরাসাতুল ফালাহ ওয়াল হারাম' এর শিক্ষক আল্লামা ঐতিহাসিক শায়খ মুহাম্মদ আরাবি মক্কী, এগিয়ে আসেন। তিনি দুই খণ্ডে 'তাহযীরুল আবকারী মিন মুহাদারাতিল খিদরী'

নামে একটি কিতাব লেখে প্রকাশ করেন। আলহামদুলিল্লাহ, কিতাবখানা খুবই তাহকীকপূর্ণ ও রেফারেন্স দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত। উক্ত কিতাবে তিনি প্রশিদ্ধদেরও কোন ভুল দেখলে তা স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। যেমন ইবনে জরীর, ইবনে কাসীর প্রমুখ। কিতাবের দু'টি খণ্ডই আলিমদের জন্য বিশেষ করে লেখকদের জন্য খুবই জরুরী। এখানে আমরা মারওয়ান সম্পর্কিত কিছু অংশ উল্লেখ করছি।

(১) মারওয়ান বিন হাকাম বিন আবুল আস (মৃত্যু: ৬৫ হিজরী) হাদীসও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে তাঁর দেখা হয়নি। তিনি তাঁর থেকে সরসরি কোন হাদীস শুনেননি। .... খিলাফতের আগ্রহ যখন চুড়ান্ত রূপ লাভ করে, তখন তিনি এও বলেছেন, 'ইবনে উমর (রা.) আমার চেয়ে উত্তম নন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হাফিয ইসমাঈলী (মৃত্যু: ৩৭১ হিজরী) ইমাম বুখারী (র.)-কে প্রচণ্ড দোষারোপ করেছেন যে, তিনি কেন বুখরী শরীফে মারওয়ানের হাদীস উল্লেখ করলেন। মারওয়ানের মারাত্মক দুর্ভাগ্যজনিত কাজসমূহের মধ্যে এটিও একটি ছিল যে, সে 'জঙ্গে জামাল'-এ হযরত তালহা (রা.) কে তীর নিক্ষেপে শহীদ করে। এর পর তরবারীর মাধ্যমে খিলাফত লাভের প্রচেষ্টা করে। (তাহযীব, খণ্ড: ১০, পৃষ্ঠা: ৯১)

বুখারী শরীফে ৫২৭ পৃষ্ঠায় আছে, হযরত তালহা (রা.) রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হেফাযত করতে গিয়ে নিজের হাত অকেজো করে ফেলেছিলেন। আল্লামা কিরমানী লেখেন- উহুদের যুদ্ধের দিন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হেফাযত করতে কেবল হযরত তালহা (রা.) অবশিষ্ট রইলেন। তখন তিনি নিজের দেহে আশিটি আঘাত খেয়েও রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হেফাযত করেছিলেন। এতে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়ে ইরশাদ করেন, তালহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। এমন জান্নাতী লোকের উপর হামলা করে হত্যা করা কেবল মারওয়ানের মত হতভাগার দ্বারা সম্ভব।

(২) শাহ ছাহেবের মতামত অনুযায়ী হযরত উসমান (রা.) এর শাহাদতের কারণও ছিল মারওয়ান। কারন সে তাঁর সচিব ছিল। সে মিসরের গভর্ণর ইবনে আবি সারাহ এর নিকট হযরত উসমান (রা.) এর পক্ষ থেকে একটি জাল চিঠি লেখে। এমনকি উসমান (রা.) এর অনুমতি ছাড়া চিঠিতে তাঁর সীল মোহরও লাগিয়ে দেয়। আর উসমান (রা.) এর উটের পিঠে তার এক দাস কিংবা আরো একজনকে বসিয়ে মিসর পাঠিয়ে দেয়। চিঠিতে সে লেখে- যে লোক মিশর থেকে কোন অভিযোগ নিয়ে মদীনায় আসবে, তারা মিশর ফেরত আসলে তাদের সবাইকে এভাবে এভাবে হত্যা করবে। পথিমধ্যে চিঠিটি ধরা পড়ে যায়। এটা নিয়ে মিশরের প্রতিনিধি দল ফেরত আসল এবং উসমান (রা.) কে বলল, আপনি

কি এমন চিঠি লিখেছেন? হযরত উসমান (রা.) কসম করে বললেন, 'আমি কখনো এমন চিঠি লিখিনি। এমনকি তা আমার জ্ঞাতসারে লেখা হয়নি। এর ফলে বিদ্রোহীরা সকলে একমত হয়ে বলল, হয়তো আপনি মারওয়ানকে আমাদের কাছে দিয়ে দেন, যাতে আমরা তাকে পূর্ণ জিজ্ঞাসাবাদ করে বিষয়টি অবগত হব। নতুবা আপনি পদত্যাগ করুন। দু'টির কোনটি না করলে তৃতীয় পথ আপনাকে শহীদ করা হবে। এর পর বিদ্রোহের দিনসমূহে বিদ্রোহীদেরকে মারওয়ান বারবার উত্তেজিত করছিল। একমাত্র মারওয়ানের কারণে হযরত আলী (রা.) এর উত্তম পরামর্শসমূহ হযরত উসমান (রা.) গ্রহণ করেননি। এর বিস্তারিত আলোচনা 'তাহযীরুন্দ আবকারী'তে নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থ থেকে বর্ণিত আছে।

(৩) হযরত মু'আবিয়া (রা.) এর অন্যান্য গভর্নরদের ব্যাপারে একথা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে যে, তারা জুমআ ও ঈদের খুতবায় হযরত আলী (রা.)-কে গালিগালাজ করত কিংবা না করত। কিন্তু মারওয়ানের ক্ষেত্রে এ কথা প্রমানিত ছিল যে, সে মদীনার গভর্নর থাকাকালীন অবশ্যই তা করত। এ কারণে সে ঈদের নামাযের আগে খুতবাহ পাঠ করত।

(৪) হযরত আলী (রা.) ছাড়াও সে হযরত হাসান (রা.) সম্পর্কে অশ্লীল কথা বলার প্রমান রয়েছে।

(৫) হযরত হাসান (রা.)-এর ইন্তিকালের পর হযরত আয়শা সিদ্দিকা (রা.) হাসান (রা.)-কে তাঁর নানাজান (রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পাশে দাফনের অনুমতি প্রদান করেন। কিন্তু মারওয়ান এর তীব্র বিরোধীতা করে, যদিও সে তখন মদীনার গভর্নর ছিল না। এমনকি এ ব্যাপারে যুদ্ধ বিগ্রহের আশংকা দেখা দিয়েছিল। যদি না হযরত আবু হুরায়রা (রা.) মধ্যস্থতা করে হযরত হাসান (রা.) কে জান্নাতুল বাকীতে দাফনের ব্যবস্থা করতেন।

(৬) ৬৩ হিজরীর হাররার ঘটনার সময় যদিও মারওয়ান মদীনার গভর্নর ছিল না, তবুও সে ও তার ছেলে আব্দুল মালিক সিরিয়ার সেনাবাহিনীকে বনি হারেসার রাস্তা দিয়ে মদীনা মুনাওয়ারায় প্রবেশ করতে দেয়। সে সময় ইয়াযিদের পক্ষে উসমান বিন মুহাম্মদ বিন আবু সুফিয়ান মদীনার গভর্নর ছিলেন। উসমান ইয়াযিদকে সংবাদ পাঠালে ইয়াযিদ মুসলিম বিন উকবার নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী মদীনা আক্রমনের জন্য রওয়ানা হয়। মদীনাবাসীগণ রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সময়কার মত পরীখা খনন করে মদীনা শরীফকে সব দিক থেকে হেফাযত করে নেন। মুসলিম বিন উকবার সেনাবাহিনী মদীনার বাইরে এসে থেমে যায়। মদীনা আক্রমনের কোন পথই পাচ্ছিল না। এমন সময় মারওয়ান ও তার ছেলের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। তারা দু'জন গোপন রাস্তা বলে দিয়ে মদীনা আক্রমন করায়। এর পর ইয়াযিদ বাহিনী তিন

দিন পর্যন্ত মদীনা শরীফে লুটতরাজ ও গণহত্যা করে। এমন সব অত্যাচার করে যা কলম দিয়ে প্রকাশ করতে আমি অক্ষম। এই মুসলিম বিন উকবা-ই তিন দিন পর আবার মক্কা মুআজ্জমা আক্রমনের জন্য রওয়ানা হয়। তিন দিনের রাস্তা অতিক্রম করে পথিমধ্যে মারা যায়। হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (রা.) বলেন, আমি সকল নামাযের পর বনু মারওয়ানের জন্য বদ-দু'আ করি।

(৭) মুস্তাদরাকে হাকিম ২য় খণ্ড, ৪৮১ পৃষ্ঠায় একটি হাদীস রয়েছে, যার সনদ সহীহ এবং আল্লামা যহবী এটার সত্যায়ন করেছেন। হাদীস হচ্ছে- আল্লাহ তা'আলা হাকাম ও তার সন্তানদের উপর লা'নত প্রদান করেন। আল্লামা যহবী 'মিযানুল ই'তিদাল' কিতাবে লেখেন, মারওয়ানের আমল ধ্বংসাত্তক সে হযরত তালহা (রা.) কে হত্যা করেছে। সে কতই না মন্দ আমলকারী ছিল।

(৮) 'তাহযীরুল আবকারী' ২য় খণ্ড, ২৮২ পৃষ্ঠায় মারওয়ানের নিকৃষ্ট কাজসমূহকে সংক্ষেপে এক স্থানে একত্রিত করেছেন। সেখানে তার বিশ্বাস ঘাতকতার ঘটনাও বর্ণিত আছে, যা সে দাহহাক বিন কায়েস-এর সাথে করেছিল।

(৯) আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান হাজ্জাজের মাধ্যমে কা'বা শরীফে গোলা বর্ষন করিয়েছিল। হাজ্জাজকে প্রেরণ করে হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.)-কে হত্যা করিয়েছিল। হযরত আমির বিন আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) বলেন, বনু মারওয়ান ৬০ বছর পর্যন্ত হযরত আলী (রা.)-কে গাল-মন্দ করেছিল ও করিয়েছিল; কিন্তু আলী (রা.) এর কোন ক্ষতি হয়নি, বরং তাঁর ইজ্জত ও মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল। শামের কিছু লোকের মুখ জিবদ্দশায়ই শুকরের আকৃতি ধারন করেছিল। (যে হযরত আলী (রা.) এর উপর প্রতি দিন এক হাজার বার লা'নত প্রদান করত।) এটাও দেখা গেছে। ('তাহযীরুল আবকারী' ২য় খণ্ড, ১৯৯ পৃষ্ঠা)

(১০) ৬৪ হিজরীতে মারওয়ান ৯ মাসের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছিল। তার মৃত্যু তার স্ত্রীর মাধ্যমে হয়েছিল। সে এক অনর্থক কাজের কারণে ঘুমন্ত অবস্থায় শ্বাস রোধ করে হত্যা করেছিল। তার ছেলেও এর প্রতিশোধ গ্রহণ করেনি এ কারণে যে, মানুষ বলবে, মারওয়ানের মত এত বড় একজন বাদশাহ এক মহিলার হাতে নিহত হয়। ('তাহযীরুল আবকারী' ২য় খণ্ড, ২৮১ পৃষ্ঠা)

(১১) মারওয়ানের পিতা হাকামও অনেক দুষ্কৃতিকারী ছিল। সে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্ত্রীগণের হুজরায় আড়ি পেতে থাকত এবং গোপনীয় কথাসমূহ মানুষের কাছে পৌঁছে দিত। এ কারণে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে এবং তার ছেলে মারওয়ানকে মদীনা মুনাওয়ারা থেকে বহিস্কার করে তায়েফে নির্বাসন দেন। হযরত আবু বকর ও উমর (রা.) এর খেলাফত কালে তারা নির্বাসিতই থাকে। অতঃপর হযরত উসমান (রা.)-এর

খেলাফতকালে পিতা-পুত্র দু'জনে মদীনা ফিরে আসে। হাফিয ইবনে হাজার (র.) 'ফতহুল বারী' 'কিতাবুল ফিতন'এ هَلاكُ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ أُغَيْلِمَةٍ سُفَهَاءَ. হাদীসের ব্যাখ্যায় লেখেন- হাকাম ও তার সন্তানদের অভিশপ্ত হওয়া সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। (আনওয়ারুল বারী ১৭ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৫০-১৫২ দেওবন্দের সাবেক মঈনে মুফতি ইদ্রিস কাসেমী তার লিখিত বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ কাশফুল বারী কিতাবে উপরে উল্লেখিত আনওয়ারুল বারীর বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। (দেখুন কাশফুল বারী, ৬ষ্ট খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৩৬-২৪০)

মারওয়ান কর্তৃক কুরআনের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে সিদ্দিকে আকবর (রা.)-এর পরিবারবর্গকে হেয়-প্রতিপন্ন করা

এ প্রসঙ্গে হাফিয ইমাদ উদ্দিন ইবনে কাসীর এর আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া কিতাব থেকে কিছু আলোচনা তুলে ধরা হলো। ৫৮ হিজরী সনে যাঁরা ইন্তিকাল করেন, তাদের একজন হলেন, হযরত আব্দুর রহমান ইবন আবু বকর (রা.)। তিনি প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা.) এর জ্যেষ্ঠ সন্তান। এটি বলেছেন, যুবাইর ইবন বাককার। তিনি আরো বলেছেন যে, হযরত আব্দুর রহমান (রা.) একজন মিষ্টভাষী ও কৌতুকপ্রিয় লোক ছিলেন। তাঁর মা হলেন উম্মু রূমান (রা.)। হযরত আয়েশা (রা.) ও আব্দুর রহমান সহোদর ভাই বোন। তিনি কিন্তু বদর ও উহুদ যুদ্ধে মুশরিকদের পক্ষ নিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন এবং আপন পিতা হযরত আবু বকর (রা.) কে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। ঐ সময় যুদ্ধের ময়দানে আবু বকর (রা.) তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আবু বকর (রা.)! আপনার দ্বারা আমাদেরকে উপকৃত হবার সুযোগ দিন।

পরবর্তীতে হুদাইবিয়ার সন্ধির মেয়াদে হযরত আব্দুর রহমান (রা.) ইসলাম গ্রহণ করলেন। তিনি মক্কা বিজয়ের পূর্বে মদীনায় হিজরত করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বারের আয় থেকে তাঁকে প্রতি বছর ৪০ ওয়াসাক করে খাদ্য শস্য প্রদান করতেন। তিনি শীর্ষস্থানীয় মুসলমানদের একজন ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওফাতের সময় তিনি তাঁর পাশে উপস্থিত হয়েছিলেন। তখন হযরত আয়েশা (রা.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাথা নিজের বুকের সাথে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। হযরত আব্দুর রহমান (রা.)-এর সাথে একটি তাজা মিসওয়াক ছিল। হযরত আয়েশা (রা.) ঐ মিসওয়াক নিয়ে কামড়িয়ে সেটিকে নরম করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দিলেন। ঐ মিসওয়াক দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব সুন্দর ও যত্নের সাথে মিসওয়াক করলেন। তারপর বললেন, اللهم الرفيق

الأعلى। 'হে আল্লাহ! শ্রেষ্ঠ বন্ধু।' এরপর তাঁর ওফাত হয়। এ প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, এ অন্তিম মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলা আমার লালা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর লালার সাথে একত্রিত করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার বুকে ঠেস দেয়া অবস্থায় ইন্তিকাল করেছেন। তিনি আমার জন্যে বরাদ্দকৃত দিবসে আমার ঘরে ইন্তিকাল করেছেন। আমি এ বিষয়ে কারো প্রতি জুলুম করিনি। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা.) ইয়মামার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি সেদিন সাতজন শত্রু সৈন্য হত্যা করেছিলেন। মাহকাম ইবন তোফায়লকে তিনিই হত্যা করেছিলেন। মাহকাম ছিল ভণ্ড নবী মুসায়লামার বন্ধু এবং সহযোগী। সে একটি প্রাচীরের ফাঁকে দাঁড়িয়ে ছিল। যরত আব্দুর রহমান (রা.) তাকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করলেন। মাহকাম তীর বিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। ঐ ফাঁক দিয়ে মুসলমানগণ দুর্গের ভিতর ঢুকে পড়েন এবং ভণ্ড নবী মুসায়লামাকে ধরে এনে হত্যা করেন। আব্দুর রহমান ইবন আবূ বকর (রা.) সিরিয়া বিজয় অভিযানেও অংশ নিয়েছিলেন। সমসাময়িক মুসলমানদের মধ্যে তিনি অন্যতম ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও নেতৃস্থানীয় লোক হিসেবে গণ্য হতেন।

আব্দুর রায্যাক .... সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আব্দুর রহমান ইবনে আবূ বকর (রা.) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। বস্তুত তিনি কোন দিন মিথ্যা কথা বলেছেন এমনটি আমার জানা নেই। তিনি তাঁর নিজের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ইয়াযীদের খলীফা মনোনয়ন বিষয়ে বাই'আত করার নির্দেশ যখন মদীনায় আসে। অর্থাৎ মদীনার অধিবাসীদেরকে যখন ইয়াযীদের খলীফারূপে স্বীকৃতি দানের বাই'আত করার নির্দেশ দেয়া হয় তখন হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবূ বকর (রা.) মারওয়ান ইবনে হাকাম কে বললেন, আল্লাহর শপথ! আপনারা তো খিলাফতের বিষয়টিকে রোমান রাজতন্ত্র কিংবা পারসিক রাজতন্ত্রের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। উত্তরে মারওয়ান বলল, 'চুপ থাকেন, আপনার সর্ম্পকে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেছেন----

وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا
يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ

অনুবাদঃ আর এমন লোক আছে যে, তার মাতা পিতাকে বলে, আফসোস! তোমাদের জন্যে। তোমরা কি আমাকে এই ভয় দেখাতে চাও যে, আমি পুনরুত্থিত হব, যদিও আমার পূর্বে বহু পুরুষ গত হয়েছে। তখন তার মাতা পিতা আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করে বলে 'দুর্ভোগ তোমার জন্যে। বিশ্বাস স্থাপন কর। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। কিন্তু সে বলে, 'এ তো অতীত কালের উপকথা ব্যতীত কিছুই নয়।' (সূরা. আহকাফ-১৭)

তখন হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, 'মারওয়ানের বক্তব্য ঠিক নয়। কারণ আমার ব্যক্তিগত পবিত্রতা বিষয়ক আয়াত ব্যতীত আমাদের পরিবার সম্পর্কে

আল্লাহ তা'আলা কোন আয়াত নাযিল করেননি।' এও বর্ণিত আছে যে, মারওয়ানের উপরোক্ত মন্তব্যের প্রেক্ষিতে হযরত আয়েশা (রা.) তাকে তিরস্কার করেন এবং তার ও তার পিতার বিরূপ সমালোচনা করে তাকে শাসিয়ে দিয়েছিলেন। অবশ্য তার ও তার পিতার মানহানি হয় এমন কথা হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন বলে যে বর্ণনা আছে, তা বিশুদ্ধ নয়।

যুবাইর ইবনে বাককার বলেছেন, ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ইয়াযীদের পক্ষে বাই'আত করতে হযরত আব্দুর রহমান (রা.) যখন অস্বীকার করলেন তখন হযরত মু'আবিয়া (রা.) হযরত আব্দুর রহমান (রা.) এর নিকট এক লক্ষ দিরহাম পাঠিয়েছিলেন। হযরত আব্দুর রহমান (রা.) ঐ দিরহাম নিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে তা ফেরত দিলেন। তিনি বললেন, আমি কি দুনিয়ার বিনিময়ে আমার দীন বিক্রি করব? তিনি তখন মক্কায় চলে গেলেন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া)

আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) আরো কিছু অগ্রসর হয়ে লিখেছেন-

আবূ যুর'আ দামেশকী আবু মুসহির মালিক থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবূ বকর (রা.) ঘুমিয়েছিলেন। আর ঐ ঘুমের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। আবূ মুস'আব এটি মালিক সূত্রে ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। ঐ বর্ণনায় এতটুকু অতিরিক্ত আছে যে, সহোদর ভাই হযরত আব্দুর রহমান (রা.) ইন্তিকাল করার পর হযরত আয়েশা (রা.) ভাইয়ের পক্ষে কতক ক্রীতদাস মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

সাওরী (র.) এটি ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ সূত্রে কাসিম থেকে বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনায় এও আছে যে, মক্কা থেকে ছয় মাইলের দূরত্বে, কারো কারো মতে বারো মাইল দূরে অবস্থিত হাবশা নামক স্থানে হযরত আব্দুর রহমান (রা.) এর ইন্তিকাল হয়। তারপর লোকজন তার খাট কাঁধে নিয়ে তাঁকে বহন করে মক্কার উঁচু অঞ্চলে নিয়ে যায় এবং সেখানে দাফন করে। হযরত আয়েশা (রা.) মক্কায় আগমন করার পর তাঁর কবর যিয়ারত করেন এবং বলেন, 'ওহ, আল্লাহর কসম! আপনার মৃত্যুর সময় আমি উপস্থিত থাকলে আপনি যেখানে মারা গিয়েছিলেন ওখান থেকে আপনাকে স্থানান্তরিত করতাম না। এরপর তিনি মুতাম্মিম ইবনে নুওয়াইরা এর কবিতাটি আবৃত্তি করলেন। মুতাম্মিম তার ভাই মালিকের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে এই কবিতা রচনা করেছিল-

وكان كندماني جذيمة برهة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا

যুগের পর যুগ আমরা একান্ত সহচররূপে ছিলাম। আমাদেরকে দেখে লোকে বলত যে, এ দু'জন আর কখনো পৃথক হবে না।

فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا

'তারপর আমরা যখন পৃথক হয়ে গেলাম তখন দীর্ঘকাল একত্রিত থাকার পরও এমন হয়ে গেলাম যেন আমি আর মালিক কোন সময় একত্রে রাত কাটাই নি।' ইমাম তিরমিযী ও অন্যরা এটি বর্ণনা করেছেন।

ইবনে সা'দ উল্লেখ করেছেন যে, একবার হযরত ইবনে উমর (রা.) আব্দুর রহমান ইবনে আবূ বকর (রা.) এর কবরের উপর একটি তাঁবূ দেখতে পেলেন। বস্তুত হযরত আয়েশা (রা.) এটি নির্মাণ করে গিয়েছিলেন। হযরত আয়েশা (রা.) ওখান থেকে চলে যাবার পর এটি হযরত ইবনে উমর (রা.) এর নজরে পড়ে। তিনি এই তাঁবূ খুলে ফেলার নির্দেশ দেন এবং বলেন, তাঁর নেক আমলই তাঁকে ছায়া দিবে। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ১৭৯-১৮০)

উল্লেখ্য: উপরোল্লেখিত ঘটনায় বর্ণিত আছে মারওয়ান অসৎ উদ্দেশ্যে সিদ্দিকে আকবরের পরিবার সম্পর্কে একটি আয়াত তিলওয়াত করেছিল। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) এর প্রতিবাদ করেছিলেন। এটা আসলে মুনাফিকদের অভ্যাস। এ প্রসঙ্গে তাফসীরে রুহুল বয়ান ও 'ইয়াহইয়া উ উলুমিদ্দীন' কিতাব থেকে একটি হাদীস উল্লেখ করছি। বর্ণিত আছে, একবার হযরত উমর ফারুক (রা.) জানতে পারলেন, কোন এক মুনাফিক তাঁর কওমের ইমামতি করে এবং সে কেবল সূরা 'আবাসা' তিলাওয়াত করে। তিনি তাকে ডেকে আনলেন অতপর: তার গর্দান উড়িয়ে দিলেন। (তাফসীরে রুহুল বয়ান, খণ্ড: ১০, পৃষ্ঠা: ৩৩১)

মারওয়ানের বেয়াদবি থেকে হযরত ফাতিমা (রা.) ও রেহাই পাননি

ইমাম হাসান বিন আলী (রা.) খিলাফতের দায়িত্ব মু'আবিয়া (রা.) এর হাতে ছেড়ে দেয়ার পর থেকে তার ও তার পরিবার বর্গের উপর বিভিন্নভাবে মানষিক নির্যাতন শুরু হয়। সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম ও মুসলমানগণ এ কারনে মর্মাহত ছিলেন। আহলে বাইতের মানসিক নির্যাতনকারীদের নেতা ছিল অভিশপ্ত মারওয়ান। মারওয়ানের এ ধরনের কার্যকলাপ সম্পর্কে ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) তারিখুল খুলাফা কিতাবে লিখেছেন- ইবনে সাদ উসাইব ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, মারওয়ান যখন আমাদের (মদিনার) গর্ভণর ছিল, তখন প্রত্যেক জুম'আয় মিম্বরে বসে আলী (রা.)কে গালি-গালাজ করত। হযরত হাসান বিন আলী (রা.) বসে বসে শুনতেন, তিনি কোন জবাব দিতেন না। একদিন হাসান (রা.) এর কাছে আলী (রা.) এর সমালোচনা করে সংবাদ পাঠাল এবং বলল, আমার কাছে তোমাকে খচ্চরের মত মনে হচ্ছে। (নাউজুবিল্লাহ) খচ্চরকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তোমার মা কে? খচ্চর বলবে আমার মা ঘুড়ি। হাসান (রা.) তার দূতকে বললেন, মারওয়ানকে বলে দাও আল্লাহর কসম আমি তাকে গালি দিয়ে তার

গুনাহ কমাতে চাই না। একদিন আমরা আল্লাহর সামনে উপস্থিত হব। যদি তুমি সত্য বলে থাক; তবে আল্লাহ তোমাকে প্রতিদান দিবেন। আর যদি মিথ্যা বলে থাক; তবে আল্লাহ প্রতিশোধ গ্রহনে অতি কঠোর। (তারিখুল খুলাফা, পৃষ্ঠা: ২৪০)

মারওয়ান সম্পর্কে সিরাজুল হিন্দ শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)- তাঁর 'ফতওয়ায়ে আযিযি' কিতাবে একটি প্রশ্নের জবাবে লেখেন-

جواب سوال خامس آنکه مروان علیه اللعنة رابد گفتن وبدل از وبیزار بودن خصوصا در سلوکے که با
حضرت امام حسین واہلبیت میمنو دند وعداوت مستقرہ ازان بزرگواران دردل داشت از لوازم سنت
ومحبت اہل بیت است کہ از جملہ فرائض ایمان است۔

অনুবাদ: পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর: মারওয়ান আলাইহিল লা'নতকে মন্দ বলা এবং অন্তর থেকে তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকা আবশ্যাক। বিশেষ করে ইমাম হুসাইন (রা.) ও আহলে বাইতের সাথে তার দুর্ব্যবহার ও শত্রুতা পোষনের কারণে। আর এ শত্রুতা ছিল তার অন্তরে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। কারণ আহলে বাইতের প্রতি মুহব্বত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আবশ্যকিয় বিষয়সমূহের এবং ফারাইযে ঈমানের অন্তর্গত। (ফতওয়ায়ে আযিযি, পৃষ্ঠা: ১৮৪)

মারওয়ান কর্তৃক মসজিদে নববী থেকে রাসূল (সা.)-এর মিম্বর শরীফ অপসারণের অপচেষ্টা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মিম্বর শরীফ অপসারণের দায়িত্ব অভিশপ্ত মারওয়ান ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না বিধায় তাকে এ দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। মিম্বরটির অনেক গুরুত্ব রয়েছে। নিম্নে আমরা বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত একটি হাদীস ও তার ব্যাখ্যা তুলে ধরছি।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, আমার ঘর ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান বেহেশতের বাগান সমূহের একটি বাগান। আর আমার মিম্বর আমার হাউজের উপর অবস্থিত। (বুখারী, মুসলিম)

এ হাদীসের দ্বারা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সতর্ক করেছেন এ ব্যাপারে যে, মিম্বর হচ্ছে মুর্খতার মরুভূমিতে মরিচা ধরা অন্তরের মরিচা নিরসনের স্থান। যেমনি-ভাবে হাউজ হচ্ছে কিয়ামতের গরমে তৃষ্ণার্ত কলিজা সমূহের তৃষ্ণা নিবারনের স্থান।

..........ইমাম মালিক (র.) বলেন, হাদীসটি তার বাহ্যিক অবস্থার উপর প্রযোজ্য রয়েছে। আর রাওদ্বা শরীফ এমন একটি মাটির টুকরো যা জান্নাত থেকে

স্থানান্তরিত করে আনা হয়েছে। এবং অচিরেই আবার সেখানে ফিরিয়ে নেয়া হবে। ইহা জমিনের অন্য অংশের মত নয়, যা ধ্বংশ হয়ে যাবে। ইবনে হজর (র.) বলেন, এর উপরেই অধিকাংশ মুহাদ্দিসের অভিমত। আর ইহা এখন প্রকৃতই জান্নাতের একটি অংশ। (মিরকাত, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৭২)

মিম্বর শরীফ অপসারণ প্রসঙ্গে আমরা বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ উমদাতুল কারী গ্রন্থ থেকে কিছু আলোচনা উল্লেখ করছি। জেনে রাখুন হযরত মু'আবিয়া (রা.)-এর খিলাফতের পূর্ব পর্যন্ত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মিম্বর শরীফ তিন স্তর বিশিষ্ট ছিল। হযরত মু'আবিয়া (রা.)-এর খিলাফতকালে মারওয়ান নিচের দিকে আরো ৩ সিড়ি বৃদ্ধি করে ইহাকে ছয় স্তর বিশিষ্ট করে। এর কারণ সম্পর্কে যুবাইর বিন বাক্কার 'আখবারুল মদীনা' গ্রন্থে বর্ণনা করেন: মারওয়ান যখন মদীনার গভর্নর ছিল তখন মু'আবিয়া (রা.) তার কাছে নির্দেশ দিয়ে সংবাদ পাঠালেন যেন সে মিম্বর শরীফকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেয়, মারওয়ান তা উপড়ালো। এর ফলে সমস্ত মদীনা শরীফ অন্ধকার হয়ে যায়। তখন মারওয়ান বের হয়ে লোকজনের উদ্দেশ্যে ভাষন দেয় এবং বলে, আমীরুল মুমিনীন আমাকে এটা সরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দেন। এর পর সে মিস্ত্রি ডাকল এবং তাতে আরো তিনটি সিড়ি বৃদ্ধি করল যা এখনও আছে।

অন্য এক সনদে বর্ণনা করেন, (মিম্বর শরীফ উপড়ানোর ফলে) সূর্য গ্রহণ দেখা দিল। (দিন এত অন্ধকার হয়েছিল যে আমরা দিনের বেলা) তারকারাজি দেখতে পেরেছিলাম। (উমদাতুল কারী, খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৩৪০, অনুরূপ বর্ণনা ফতহুল বারীতেও রয়েছে)

আনসারদের গুণাবলী

হযরত আনাস (রা.) বলেন, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট বাহরাইন থেকে কিছু অর্থ-সম্পদ আসল। মুহাজির ও আনসারগণ একে অপর থেকে এ ব্যাপারে খবর পেয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হলেন। অত:পর বর্ণনাকারী দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসারদেরকে বললেন, আমি যতখানি জানি, ভয় ভীতিকর পরিস্থিতিতে (জান দিতে হলে) তোমাদের সংখ্যা বেশী হয় এবং লোভ-লালসার বিষয়ে (নেবার সময় হলে) তোমাদের সংখ্যা কম হয় (অর্থাৎ এ সময় তোমরা পিছনে সরে থাক।)

অপর এক বর্ণনায় আছে, হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু তালহা (রা.) কে বললেন, তোমার কওম (অর্থাৎ আনসারদের)কে আমার সালাম বলবে, আর তাদেরকে বলবে যে, আমার জানামতে তারা খুবই চরিত্রবান ও ধৈর্যশীল।

অপর এক বর্ণনায় হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে অসুখে ইন্তেকাল করেছেন সে অসুখের সময় হযরত আবু তালহা (রা.) তাঁকে দেখতে গেলে তিনি বললেন, তোমার কওম (আনসারদের)কে আমার সালাম দিও, নি:সন্দেহে তারা খুবই চরিত্রবান ও ধৈর্যশীল। (বায়হাকী, কানযুল উম্মাল, ইবনে আসাকির)

আল্লাহ ও তার রাসূল (সা.)-এর উপর আনসারদের সন্তুষ্টি

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, হুনাইনের যুদ্ধে গণীমতের বহু অর্থ সম্পদ লাভ হবার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা সম্পূর্ণ কুরাইশ ও আরবের সে সকল (নওমুসলিম) লোকদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন, যাদের মন রক্ষা করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। আনসারগণ তা থেকে কম বেশী কিছুই পেলেন না। তাতে তারা মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেন এবং তাদের মধ্য থেকে কেউ বললেন, আল্লাহর কসম! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো আপন কওমের সাক্ষাৎ পেয়ে গেয়েছেন। (এখন তিনি মক্কায় থেকে যাবেন, মদীনায় আর ফিরে যাবেন না)। হযরত সা'দ ইবন উবাদাহ (রা.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আনসার গোত্রের মনে আপনার ব্যাপারে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কি কারণে? হযরত সা'দ (রা.) বললেন, আপনি গণীমতের সম্পূর্ণ অর্থ-সম্পদ আপনার কওম ও অন্যান্য আরবদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। আনসারগণ তা থেকে কিছুই পেল না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে সা'দ! এ ব্যাপারে তোমার কি মতামত? তিনি বললেন, আমিও তো আমার কওমেরই একজন। (অর্থাৎ কওমের সাথে আমিও একমত।) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার কওমকে আমার জন্য যে বেষ্টনীর ভেতর সমবেত কর। তারা সমবেত হলে আমাকে সংবাদ দিও। হযরত সা'দ (রা.) বাইরে এসে আনসারদের মধ্যে ঘোষণা দিলেন এবং তাদের সকলকে উক্ত বেষ্টনীর ভেতর সমবেত করলেন। মুহাজিরদের মধ্য থেকে কয়েকজন আসলে তাদেরকেও (ভিতরে প্রবেশের) অনুমতি দিলেন। তারা ভিতরে প্রবেশ করলেন। তারপর আরো কয়েকজন আসলে তাদেরকে হযরত সা'দ (রা.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম! আপনি যেখানে আনসার গোত্রকে সমবেত করতে বলেছিলেন, তারা সেখানে সমবেত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসলেন এবং তাদের মাঝে বক্তৃতার উদ্দেশ্যে দাঁড়ালেন। আল্লাহ তা'লার প্রশংসা ও গুণগান বর্ণনার পর বললেন, হে আনসারগণ! এমন নয় কি যে, আমি যখন তোমাদের নিকট এসেছিলাম তোমরা পথভ্রষ্ট ছিলে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে হেদায়েত দান করেছেন। তোমরা সকলে অভাবগ্রস্থ ছিলে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সচ্ছল করেছেন, তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্তরসমূহকে মিলিয়ে দিয়েছেন? আনসারগণ (উত্তরে) বললেন, হ্যাঁ, এরূপই হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আনসারগণ তোমরা উত্তর কেন দিচ্ছ না? তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি বলব, আপনাকে কি উত্তর দেব? আল্লাহ ও তাঁর রাসূলেরই অনুগ্রহ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা ইচ্ছা করলে বলতে পার এবং তোমরা সত্য কথাই বলবে এবং তোমাদেরকে সত্যবাদী বলা হবে যে, আপনি অভাবগ্রস্থ ছিলেন, আমরা আপনাকে আর্থিক সাহায্য দিয়েছি; আপনি অসহায় ছিলেন, আমরা আপনার সহায়তা করেছি। তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরই অনুগ্রহ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা দুনিয়ার এ ঘাস-পাতার কারণে আমার উপর অসন্তুষ্ট হচ্ছ? আমি তো এ গণীমতের অর্থ-সম্পদ নবাগত মুসলমানদেরকে তাদের মন রক্ষার্থে দিয়েছি, আর তোমাদেরকে ইসলামের ন্যায় মহান নি'আমত- যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ভাগ্যে লিখেছেন তাতে সোপর্দ করেছি। (গণীমতের মাল না পেলেও তোমরা ইসলামের ন্যায় নি'আমত লাভের উপর সন্তুষ্ট থাকবে)। হে আনসারগণ! তোমরা তাতে সন্তুষ্ট নও যে, লোকেরা উট-বকরী নিয়ে নিজেদের ঘরে ফিরে যাবে আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে ঘরে ফিরে যাবে? সে পাক যাতের কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যদি লোকজন এক পাহাড়ী পথে চলে এবং আনসাররা আরেকটি পথে চলে, তবে আমি আনসারদের চলতাম। হে আল্লাহ! আনসারদের উপর এবং আনসারদের সন্তানদের উপর এবং তাদের সন্তানদের উপর রহমত বর্ষণ করুন।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা ও দু'আ শুনে আনসারগণ কাঁদতে লাগলেন এবং কান্নায় তাদের দাঁড়ি ভিজে গেল। তারা বললেন, আমরা আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে সন্তুষ্ট আছি এবং তাঁর রাসূলের অর্থ-সম্পদ বন্টনের উপর রাজী আছি। অত:পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখান থেকে ফিরে এলেন এবং আনসারগণও চলে গেলেন। (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, কানযুল উম্মাল)

আনসারদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাদের খিদমত

হযরত উসাঈদ ইবন হুদাইর (রা.) এর ঘটনা: হযরত আনাস (রা.) বলেন, হযরত উসাইদ ইবন হুদাইর (রা) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে উপস্থিত হলেন, তিনি তখন খাদ্যদ্রব্য বন্টন করছিলেন। হযরত উসাইদ (রা.) বনু যাফর গোত্রের এক আনসারী পরিবারের কথা উল্লেখ করে বললেন, তারা খুবই অভাবগ্রস্থ এবং তাদের অধিকাংশই মহিলা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে উসাইদ! তুমি আমার নিকট আগে বললে না, এখন তো যা কিছু হাতে ছিল শেষ হয়ে গেছে। আগামীতে যখনই শুনতে পাও যে, আমার নিকট কিছু এসেছে তখন তুমি সে পরিবারের কথা আমাকে স্মরণ করে দিবে। তারপর যখন খায়বার থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট খেজুর ও যব আসল তখন তিনি তা লোকদের মধ্যে বন্টন করলেন। আনসারদের মধ্যেও বন্টন করলেন এবং তাদেরকে আরো অধিক পরিমাণে দিলেন। হযরত উসাইদ (রা.) শুকরিয়া আদায় করতে গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন , অথবা বললেন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে শ্রেষ্ঠ বিনিময় দান করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা আনসারগন, তোমাদেরকেও আল্লাহ তা'আলা উত্তম বিনিময় অথবা বলেছেন, শ্রেষ্ঠ বিনিময় দান করুন। আমার জানামতে তোমরা খুবই চরিত্রবান ও ধৈর্যশীল। আমার পরে খিলাফতের বিষয়ে ও অর্থ-সম্পদ বন্টনের ব্যাপারে তোমরা অন্যদেরকে তোমাদের উপর অগ্রাধিকার দিতে দেখবে। হাউজে কাওসারের নিকট আমার সাথে তোমাদের সাক্ষৎ পর্যন্ত তোমরা ধৈর্য ধর। (কানযুল উম্মাল, খণ্ড:৭, পৃষ্ঠা: ১৩৫)

আনসারদের সাথে হযরত উমর (রা.) এর সদ্ব্যবহার:

অত:পর হযরত উমর ইবন খাত্তাব (রা.) এর খিলাফত আমলে তিনি লোকদের মধ্যে পোশাক বন্টন করলেন। এক জোড়া পোশাক তিনি আমার (হযরত উসাঈদ বিন হুদাইর) জন্যও পাঠালেন, যা দেখতে আমার নিকট ছোট মনে হল। আমি নামায পড়ছিলাম, এমন সময় একজন কোরাইশী যুবক আমার পাশ দিয়ে গেল । তার পরনেও এ ধরনের এক জোড়া পোশাক ছিল, যা এতবড় ছিল যে, সে তা মাটিতে হেঁচড়িয়ে যাচ্ছিল। আমার তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা স্মরণ হল যে, তিনি বলেছিলেন, আমার পরে তোমরা অন্যদেরকে তোমাদের উপর অগ্রাধিকার দিতে দেখবে। আমি এ কথা উল্লেখ করে বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য বলেছেন। এক ব্যক্তি হযরত উমর (রা.) কে আমার এ কথা বলে দিল। হযরত উমর (রা.) আমার

নিকট আসলেন। আমি তখন নামায পড়ছিলাম। তিনি বললেন, হে উসাইদ! নামায শেষে করে নাও। আমি নামায শেষ করলে তিনি বললেন, তুমি কি বলছ? আমি তাঁকে সব কথা খুলে বললাম। হযরত উমর (রা.) বললেন, আমি এ জোড়া (বড় বলে) অমুক (আনসারী) সাহাবীর নিকট পাঠিয়েছিলাম, যিনি বদর, উহুদ ও আকাবার বাই'আতে শরীক ছিলেন। (যেহেতু তিনি তোমার অপেক্ষা দ্বীনী সম্মানে অগ্রগামী ছিলেন, সেহেতু আমি তাকে তোমারটির তুলনায় বড় জোড়া দিয়েছিলাম।) অত:পর এ কোরাইশী যুবক গিয়ে সে আনসারী সাহাবীর নিকট থেকে কিনে নিয়ে সে পরিধান করেছে। তোমার কি ধারণা হয় যে, আনসারদের উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়ার ঘটনা আমার যুগে ঘটবে? হযরত উসাইদ (রা.) বলেন, আমি বললাম, আল্লাহর কসম! হে আমীরুল মুমিনীন! আমার ধারণা যে, আপনার আমলে তা ঘটবে না। (رواه احمد)

আহলে বাইত বিদ্বেষী যেমন: মারওয়ান, যিয়াদ, ইয়াযিদ, মুসলিম বিন উকবাহ, হাজ্জাজ ও হিশাম প্রমূখ শাসকদের পক্ষে যারা উকালতি করে থাকেন এবং আহলে বাইত ও নবী প্রেমিক সাহাবা, তাবিঈদের সাথে তাদেরকে তুলনা করে থাকে তাদের সর্ম্পকে কবি বলেন- چہ نسبت خاک را با عالم پاک ☆ کجا عیسیٰ کجا دجال ناپاک

অনুবাদ: আসমান- যেখানে কোন পাপকার্য সংঘটিত হয়না- এর সাথে যমীনের কি কোন তুলনা হতে পারে? কোথায় নবী ঈসা (আ.) আর কোথায় নাপাক দাজ্জালের স্থান।

হযরত আবূ আইয়ুব আনসারী (রা.)

আলা উদ্দিন আলী মুত্তাকী (মৃত্যু-৯৭৫) কানযুল উম্মাল কিতাবে হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)-কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খিদমতের প্রতিদান হিসাবে ইবনে আব্বাস (রা.)-এর খিদমত সর্ম্পকে একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি নিম্নরূপ:

مسند أبي أيوب: عن حبيب بن أبي ثابت أن أبا أيوب أتى معاوية فشكا إليه أن عليه دينا، فلم ير منه ما يحب ورأى ما يكرهه، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم سترون بعدي أثرة! قال: فأي شيء قال لكم؟ قال: اصبروا، قال: فاصبروا، فقال: والله لا أسالك شيئا أبدا! فقدم البصرة فنزل على ابن عباس، ففرغ له بيته وقال: لأصنعن بك كما صنعت برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر أهله فخرجوا وقال: لك ما في البيت كله وأعطاه أربعين ألفا وعشرين مملوكا.(الروياني، (كر).

অনুবাদ: হযরত হাবিব বিন সাবিত (র.) হতে বর্ণিত, হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) একবার হযরত মু'আবিয়া (রা.) এর কাছে গেলেন এবং তিনি কিছু ঋণী হয়ে গেছেন বলে অভিযোগ করলেন। কিন্তু মুআবিয়া (রা.) এর কাছ থেকে তিনি যা পছন্দ করেন তা পাননি বরং তিনি যা চাননি তা পেলেন। (তা দেখে) হযরত আবু আইয়ুব (রা.) বললেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, শিগ্রই তোমাদের উপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেয়া হবে। হযরত মুআবিয়া (রা.) বললেন, তোমাদেরকে কি বললেন? আবু আইয়ুব (রা.) বললেন, বলেছেন- তোমরা ধৈর্য ধারন করবে। মুআবিয়া (রা.) বললেন, তাহলে ধৈর্য ধর। হযরত আবু আইয়ুব (রা.) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি কোন দিন তোমার কাছে কোন কিছু চাইব না। এর পর তিনি বসরা চলে গেলেন এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর বাড়িতে গেলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তাঁর জন্য একটি ঘর খালি করে দিলেন এবং বললেন, আমি এমনটি করব যেমনটি আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য করেছেন। এরপর তিনি তাঁর পরিবারের লোকজনকে বের হয়ে যেতে বললেন, এবং আবু আইয়ুব (রা.) কে উদ্দেশ্য করে বললেন, ঘরে যা কিছু আছে সবই আপনার। তিনি তাঁকে চল্লিশ হাজার মুদ্রা ও বিশ জন দাসও দান করলেন। (রুয়ানি, ইবনে আসাকির) (কানযুল উম্মাল, হাদীস নং ৩৭৫৬৯)

আবু আইয়ুব (রা.) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খিদমত সম্পর্কে মুসলিম শরীফের একটি হাদীস নিম্নে উল্লেখ করছি।

যখন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরত করে মদীনায় তাশরীফ নিলেন তখন হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) এর ঘরে অবস্থান করলেন। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরের নিচের অংশে অবস্থান নিলেন এবং হযরত আবু আইয়ুব (রা.) পরিবারসহ ঘরের উপরের অংশে থাকতেন। এক রাতে তিনি ঘুম থেকে জেগে বলতে লাগলেন, আমি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সর মুবারকের উপর হাঁটা চলা করছি। এ কথা বলে তিনি ঘরের এক কোণে সরে গিয়ে রাত যাপন করলেন। সকাল হলে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে আরয করলেন, নিচে চলে আসার অনুমতি দিতে। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, 'নিচের অংশে অবস্থান করা আমার জন্য সহজ। হযরত আবু আইয়ুব (রা.) জবাব দিলেন, আমি সে ছাদে আরোহন করতে পারব না, যে ছাদের নিচে আপনি অবস্থান করছেন। একথা শুনে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপরে তাশরীফ নিলেন আর আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)

নিচে চলে আসলেন। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য খাবার পাঠাতেন। যা অবশিষ্ট থাকত তা ফেরত আসলে তিনি খাদিমকে জিজ্ঞেস করতেন, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আঙ্গুল মুবারক কোন অংশে লেগেছে। সেই অংশ থেকে তিনি খেতেন। একদিন খাবার তৈরী করলেন, এর মধ্যে রসুনও ছিল। অভ্যাসবশতঃ তিনি জিজ্ঞেস করলেন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আঙ্গুল মবারক কোথায় লেগেছে। খাদিম জবাবে বললেন, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাবার খাননি। এতে আবু আইয়ুব (রা.) ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, রসুন কি হারাম? রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন এটা হারাম নয় তবে আমি তা অপছন্দ করি। হযরত আবু আইয়ব আনসারী (রা.) বললেন, আপনি যা অপছন্দ করেন আমিও তা অপছন্দ করি। (রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক) রসুন অপছন্দ করার কারণ ছিল তাঁর কাছে ফেরেশতা আসতেন। (মুসলিম শরীফ, বাব, রসুন খাওয়া জায়িয সম্পর্কে)

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী (র.) লেখেছেন, আবু আইয়ুব (রা.) এর উপরে অবস্থান না করা উত্তম আদব ও সম্মানীকে সম্মান করার দলীল। এছাড়াও এ হাদীসে রয়েছে সৎকর্মশীলদের উচ্ছিষ্ট থেকে বরকত হাসিল করার প্রমাণ। (শরহে নববী)

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তাবাররুকাতের ব্যাপারে সাহবায়ে কিরাম ও মুনফিকদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য

আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সুলুল ছিল মুনাফিকদের সরদার। তার একটি ঘটনা আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ুতী (রা.) এর তাফসীরে দুররুল মানসূর থেকে উল্লেখ করছি।

আবদ ইবনে হুমাইদ ও ইবনে মুনযির হাকম এর সুত্রে বর্ণনা করেন।হযরত ইকরামা (রা.) হতে বর্ণিত যে, আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সুলুল-এর একজন ছেলে ছিল যার ছিল হুবাব। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নাম পরিবর্তন করে রাখলেন আব্দুল্লাহ। আব্দুল্লাহ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আমার পিতা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিয়ে থাকেন। আমাকে অনুমতি দিন আমি তাকে হত্যা করব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনম তুমি তোমার পিতাকে হত্যা করো না। এর পর তিনি আবারো

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আমার পিতা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিয়ে থাকেন। আমাকে অনুমতি দিন আমি তাকে হত্যা করব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন তুমি তোমার পিতাকে হত্যা করো না। তিনি আবারো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আমার পিতা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিয়ে থাকেন। আমাকে অনুমতি দিন আমি তাকে হত্যা করব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনম তুমি তোমার পিতাকে হত্যা করো না। তৃতীয়বার হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাহলে আমাকে অনুমতি দিন আপনার উযুর অবশিষ্ট কিছু পানি তাকে পান করাই যাতে তার অন্তর নরম হতে পারে। এর পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উযু করলেন, অবশিষ্ট পানি তাঁকে দিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) এ পানি নিয়ে গেলেন এবং পিতাকে পান করালেন। এর পর বললেন, আপতি কি জানেন আপনাকে কি পান করালাম। সে বলল, তুমি আমাকে তোমার মায়ের পেশাব পান করিয়েছো। তার ছেলে (আব্দুল্লাহ) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি আপনাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উযুর অবশিষ্ট পানি পান করিয়েছি। (আদ-দুররুল মানসূর, খণ্ডঃ ২৮, পৃষ্ঠাঃ ১৭৫)

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)'র দৃষ্টিতে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর শরীফের মর্যাদা

ইবনে হজর হায়সামী মাজমাউয যাওাইদ কিতাবে 'অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে শাষকের পদ সমর্পন' অধ্যায়ে একটি রেওয়ায়ত উল্লেখ করেছেন। তা হল-'হযরত দাউদ ইবনে সালেহ বর্ণনা করেন, একদা মারওয়ান ইবনে হাকাম (মসজিদে নববীতে) এলো এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা মোবারকে চেহারা রাখা অবস্থায় এক ব্যক্তিকে দেখতে পেল। তাকে বলল, তুমি কি জান তুমি কি করছ? মারওয়ান যখন তার দিকে অগ্রসর হল, তখন দেখতে পেল যে, সে ব্যক্তি হলেন হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) বলেন, হ্যাঁ, (আমি জানি আমি কী করছি) আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসেছি; আমি কোন পাথরের নিকট আসিনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, তোমরা ঐ সব লোকের জন্য কেঁদো না যাদের জন্য উপযোক্ত লোককে শাষক বানানো হয়েছে,

বরং ঐ সব লোকদের জন্য কাঁদো যাদের জন্য অনুপযুক্ত লোককে শাষক নিযুক্ত করা হয়েছে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ইলাউস সুনান, মাজমাউয যাওয়ায়িদ)
উল্লেখ্য যে, কোন কোন ঐতিহাসিক বলেছেন, হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) এর জানাযার নামাযের ইমামতি করেছে ইয়াযিদ। এতে সমস্যার কিছু নেই। কারণ যে সমস্ত জঘন্য অপকর্মের কারণে তার উপর কুফরী ফতওয়া প্রদান করা হয়েছে তা সে হযরত মুআবিয়া (রা.) এর ইন্তিকালের পর করেছে। শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) তার 'শরহে তারাজিমে আবওয়াবে বুখারী' পুস্তিকায় ইয়াযিদের ব্যাপারে যে বক্তব্য দিয়েছেন তাই এর প্রমান।

হযরত আলী (রা.)-এর প্রতি হযরত উমর বিন আব্দুল আযিয (রা.)-এর সম্মান প্রর্দশন

হযরত উমর বিন আব্দুল আযিয (রা.) উমাইয়া শাসকদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি, যিনি খুলাফায়ে রাশিদীনের অনুকরনে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। তিনি ছিলেন প্রথম মুজাদ্দিদ। তিনি বনি উমাইয়ার সকল কুসংস্কারকে দূর করেছিলেন। তিনি উমর (রা.) এর নাতনীর ছেলে। তার জন্ম ৬১ হিজরীতে। তিনি ৯১-১০১ হিজরী পর্যন্ত খেলাফতের দায়িত্বে ছিলেন। বনি উমাইয়ার অপকর্মের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল আলী (রা.) এর সমালোচনা করা। তিনি শিক্ষা জীবনে উস্তাদের নসিহতে এ কাজ থেকে বিরত থাকেন। প্রমাণ স্বরূপ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া কিতাব থেকে কিছু আলোচনা নিম্নে তুলে ধরা হল।
হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয হাদীস শ্রবণ করতে উবায়দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহর দরসে প্রায়ই যেতেন। এসময় উবায়দুল্লাহর কাছে সংবাদ পৌছল যে, তিনি হযরত আলী (রা.)'র সমালোচনা করেন। এরপর যখন হযরত উমর বিন আব্দুল আযিয আসলেন, তখন উবায়দুল্লাহ তাকে এড়িয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। হযরত উমর বিন আব্দুল আযিয বসে তার অপেক্ষা করতে লাগলেন। সালাম ফিরিয়ে তিনি রাগতভাবে উমরের দিকে মনোনিবেশ করে বলেন, তোমার কাছে কবে এ তথ্য পৌঁছেছে যে, সন্তুষ্ট হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা বদর যোদ্ধাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত উমর বিন আব্দুল আযিয (রা.) তার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বলেন, আমি প্রথমত মহান আল্লাহর দরবারে তারপর আপনার কাছে ওযরখাহী করছি। আল্লাহর কসম, আমি এর পুনরাবৃত্তি ঘটাব না। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর হতে তাকে কখনও হযরত আলী সম্পর্কে ভাল ছাড়া মন্দ কোন আলোচনা করতে শোনা যায়নি। (আল-বিদায়া ওয়ন নিহায়া, খণ্ড: ৯, পৃষ্ঠা: ৩০৬)

হযরত উমর বিন আব্দুল আযিয (রা.)-এর অন্তরে মদীনা শরীফের মর্যাদা

৬৩ হিজরীতে ইয়াযিদের নির্দেশে মুসলিম বিন উকবার নেতৃত্বে মদীনা শরীফে হামলা চালানো হয়। তিন দিনের জন্য মদীনাকে হালাল করে দেওয়া হয়। অথচ উমর বিন আব্দুল আযিয (রা.) মদীনা শরীফকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখতেন। আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া কিতাবে উল্লেখিত নিম্নের ঘটনা থেকে ইহা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়।
ইমাম মালিক বলেন, তিরানব্বই হিজরীতে হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রা.) যখন পবিত্র মদীনার প্রশাসক পদ হতে অপসারিত হন, তখন সেখান হতে বের হওয়ার সময় তিনি সেদিকে ফিরে তাকালেন এবং কাঁদতে কাঁদতে তার মাওলা মুযাহিমকে বললেন, হে মুযাহিম! আমার আশঙ্কা হয় ঐ সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত হলাম কি না যাদেরকে (আর্বজনারূপে) পবিত্র মদীনা নির্বাসিত করেছে। অথাৎ পবিত্র মদীনা তার আবর্জনা বের করে দিবে যেমনভাবে হাপর (গলিত) লোহার আবর্জনা বের করে দেয় এবং তার নির্ভেজাল অংশকে আরও খাঁটি করে। (আল-বিদায়া ওয়ন নিহায়া, খণ্ড: ৯, পৃষ্ঠা: ৩০৯)

হযরত ফাতিমা (রা.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

মাওলানা ইদ্রিস কান্দুলভী সীরতুল মুস্তফা কিতাবে লিখেছেন, তাঁর নাম হচ্ছে ফাতিমা এবং যাহরা ও বাতুল হচ্ছে উপাধি। তাঁকে বাতুল এজন্য বলা হয় যে, বাতুল, বাতল্লুন অর্থাৎ কাতয়ুন থেকে নির্গত। তিনি মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে পৃথিবীর অপরাপর মহিলা থেকে স্বতন্ত্র ছিলেন। অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য সব কিছু থেকে তিনি আলাদা ছিলেন। অভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতা, প্রফুল্লতা ও আলোকিত হওয়ার কারনে তাঁকে যাহরা বলা হয়।
ইবনে আব্দুল বার বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বের বছর জন্মগ্রহণ করেন। ইবনে জওযী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তপ্রাপ্তির পাঁচ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন যখন কুরাইশগণ কা'বা শরীফের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করছিল। (যুরকানী, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ২০২)
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কন্যাদের মধ্যে হযরত ফাতিমা (রা.) ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। সর্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন হযরত যয়নব (রা.)। অতঃপর হযরত

রুকাইয়া, অতঃপর উম্মে কুলসুম, অতঃপর ফাতিমা (রা.) এভাবে জন্মগ্রহণ করেন। (ইস্তিআব লি-ইবনে আব্দুলর বার, খণ্ডঃ ৩ পৃষ্ঠাঃ ৩৭৩)

২য় হিজরীতে হযরত আলী (রা.)-এর সাথে তাঁর বিবাহ হয়। প্রথমোল্লেখিত মতামত অনুযায়ী হযরত ফাতিমা (রা.)-এর ঐ সময় বয়স হয়েছিল পনের বছর সাড়ে পাঁচ মাস। দ্বিতীয় মতামত অনুযায়ী উনিশ বছর দেড় মাস।

(মু'জামে তাবরানীতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আমি যেন ফাতিমার বিবাহ হযরত আলী (রা.)-এর সাথে সম্পন্ন করি। এ হাদীসের সমস্ত রাবী নির্ভরযোগ্য। (যুরকানী, খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ৫)

হযরত ফাতিমা (রা.)-এর সন্তান ছিলেন পাঁচজন। এর মধ্যে তিনজন ছেলে, দু'জন মেয়ে। হাসান, হুসাইন, মুহসিন, উম্মে কুলসুম, উম্মে যয়নব।

হযরত ফাতিমা (রা.) ছাড়া অন কোন মেয়ে থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধারা বিস্তার লাভ করেনি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের ছয় মাস পর ১১ হিজরীর রমজান মাসে হযরত ফাতিমা (রা.) ইন্তিকাল করেন। (সীরাতুল মুস্তফা, খণ্ডঃ ৩, পৃষ্ঠাঃ ৩৪৫-৩৪৬)

হযরত ফাতিমাতুয যাহরা (রা.)-এর ফযিলত

হযরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা.) হতে বর্ণিত যে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ফাতিমা আমার শরীরের অংশ। সুতরাং যে তাকে অসন্তুষ্ট করল, সে যেন আমাকেই অসন্তুষ্ট করল। (বুখারী, মুসলিম)

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামর আযাদকৃত গোলাম হযরত সাওবান (রা.) বর্ণনা করেন, হুজুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরের ইচ্ছা করতেন, তখন স্বীয় পরিবারবর্গের মধ্য হতে সর্বশেষ যার সাথে কথোপকথন করে সফরে রওয়ানা দিতেন, তিনি হচ্ছেন হযরত ফাতিমা (রা.)। আর সফর হতে প্রত্যাগমণ করে সর্বপ্রথম যার নিকট তাশরিফ নিতেন, তিনিও হচ্ছেন হযরত ফাতিমা (রা.)। (আবু দাউদ)

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় কন্যা হযরত ফাতিমা (রা.)-এর চেয়ে অধিক অন্য

কাউকে চাল-চলন, স্বভাব-চরিত্র, কাজ-কর্ম এবং উঠা-বসাতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ দেখিনি। (তিরমিযী)

হযরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিঃসন্দেহে, ফাতিমা আমার ফলবান (বৃক্ষের) শাখা। যে বস্তু তাকে সন্তুষ্ট করে, তা আমাকেও সন্তুষ্ট করে। (পক্ষান্তরে) যে বস্তু তাকে কষ্ট দেয়, তা আমাকেও কষ্ট দেয়। (যাহাবী, সিয়রু আলামিন নুবালা, ফতহুল বারী, তাফসীরে ইবনে কসীর)

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী, হযরত ফতিমা, হযরত হাসান, এবং হযরত হুসাইন (রা.) কে বললেন, আমি তার সাথে লড়ব, (যুদ্ধ করবো) যার সাথে তোমরা লড়বে এবং আমি তার সাথে সন্ধি করবো, যার সাথে তোমরা সন্ধি করবে। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যারা আহলে বাইতের (ফাতিমার পরিবারের) সাথে বিদ্বেষ রাখে, তারা কপট, মুনাফিক। (আহমদ ইবনে হাম্বল, ফাযাইলুস সাহাবা)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যদি কোন ব্যক্তি কাবার পাশে রুকনে ইয়ামনি ও মাকামে ইব্রাহিমের মধ্যবর্তী স্থানে দণ্ডায়মান হয়ে নামায আদায় করে এবং রোযাও রাখে, অপরদিকে আহলে বাইতের সাথে বিদ্বেষ রেখে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে জাহান্নামে যাবে। (মুহিব্বে তাবারী, যখায়েরুল উকবা ফি মানাকিবি যবিল কুরবা পৃষ্ঠাঃ ৫১)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন ফাতিমা (রা.)-কে আলী (রা.)-এর সাথে বিয়ে দিই। (হায়সমী, মাজমাউয যাওয়ায়িদ)

হযরত ফাতিমা বিনতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তিম শয্যায় হযরত হাসান ও হুসাইনকে (রা.) নিয়ে তাঁর খিদমতে উপস্থিত হলেন এবং আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এরা আপনার সন্তান (নাতি)। তাদেরকে কোন সম্পদের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হাসানের জন্য আমার প্রতাপ ও নেতৃত্ব আর হুসাইনের জন্য হচ্ছে আমার বীরত্ব ও বদান্যতা। (কানযুল উম্মাল)

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত যে, তিনি হযরত ফাতিমা (রা.)'র নিকট গিয়ে বললেন, হে ফাতিমা! আল্লাহর কসম! আপনি ব্যতীত অন্য কাউকে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অধিক প্রিয় দেখিনি। আল্লাহর কসম! মানুষের মধ্যে অন্য কেউ আমার নিকট আপনার চেয়ে অধিক প্রিয় নয়, আপনার পিতা ছাড়া। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, মসনদে আহমদ ইবনে হাম্বল, ফাযায়িলে সাহাবা)

খারিজীদের সম্পর্কে রাসূল (সা.) এর ভবিষ্যৎবাণী

বুখারী ও নাসাঈ শরীফে আছে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সদকার অংশ বণ্টন করছিলেন। এমন সময় যুল-খুয়াইসিরাহ তাইমি সেখানে এল এবং বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (বণ্টনের) ক্ষেত্রে ইনসাফ করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বললেন, তোমার ধ্বংস হোক! আমি যদি ইনসাফ না করি তাহলে কে করবে। তা দেখে হযরত উমর (র.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! অনুমতি দিন আমি তাকে হত্যা করব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাকে ছেড়ে দাও, কারণ তার এমন কিছু সঙ্গী রয়েছে যাদের নামাযের তুলনায় তোমাদের কেউ নিজের নামাযকে তুচ্ছ মনে করবে এবং তাদের রোযার তুলনায় তোমাদের কেউ নিজের রোযাকে তুচ্ছ মনে করবে। (তাদের অবস্থা এমন যে,) তারা দীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমনিভাবে তীর শিকারের দেহ ভেদ করে বেরিয়ে যায়। তীরের পরের দিকে তাকালে তাতে কিছুই দেখা যাবে না, যখন তার ----- দিকে দেখা হয় তখনও কিছুই দেখা যাবে না অথচ এটা গোবর ও রক্ত ভেদ করে চলে গেছে। তাদের নিদর্শন হচ্ছে এমন একজন কালো রঙের লোক যার একটি হাত কিংবা (তিনি বলেছেন) একটি স্তন মহিলাদের হাত কিংবা স্তনের মত যেন তুলতুলে এক গোশতের টুকরো। এরা ইসলামে কিছু দিন অবস্থান করে এর পর তা থেকে বেরিয়ে যাবে। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, এদেরকে উদ্দেশ্য করেই আল্লাহ পাক وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ইযালাতুল খাফা, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১০৮)

বনু উমাইয়ার জালে ধরা পড়ল খারিজীরা

খারিজীদের একটি অভ্যাস ছিল কুরআনে কারীমের দোহাই দিয়ে মু'মিন বান্দাদেরকে কুরআন বিরোধী আখ্যায়িত করে হত্যা করা। এ প্রসঙ্গে বুখারী শরীফের নিম্নবর্ণিত হাদীসখানা উল্লেখ করা যেতে পারে- 'হযরত ইবনে উমর (রা.) তাদেরকে আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্ট সৃষ্টি হিসেবে মনে করতেন। তিনি আরো বলেন, এরা কাফিরদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ আয়াতকে মুমিনদের বিরোদ্ধে প্রয়োগ করে। (বুখারী)

সিফফীনের যুদ্ধে যখন শামবাসীরা পরাজয়ের ব্যপারে নিশ্চিত হয়ে গেল, তখন আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে পবিত্র কুরআন উত্তোলন করল! এ প্রসঙ্গে হাফিয ইমাদ উদ্দীন ইবনে কাসীর (র.)-এর আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া কিতাব থেকে কিছু আলোচনা পেশ করা হল। এ আলোচনা দ্বারা এ কথা স্পষ্ট প্রমাণিত হবে, খারিজীরা বনু উমাইয়ার কুরআন উত্তোলনকে কেন্দ্র করে আলী (রা.)'র বিরোধিতার সুযোগ গ্রহণ করেছে। ইবনে কাসীর লিখেছেন, শামীরা কুরআন কারীম উঁচিয়ে ধরলে ইরাকীরা বলল, আমরা মহান আল্লাহর কিতাবে সাড়া দিব এবং সেদিকে ধাবিত হব। আবু মিখনাফ বলেছেন, আব্দুর রহমান ইবনে জুনদুব আযদী তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আলী (রা.) বললেন, হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা ন্যায় ও সত্যের দিকে এবং শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধের দিকে এগিয়ে চল। কেননা, মু'আবিয়া, আমর ইবনুল আস, ইবনে আবু মু'আইত, হাবীব ইবনে মাসলামা, ইবনে আবু সারহ, দাহহাক ইবনে কায়েস- এরা দীন ও কুরআনের একনিষ্ঠ অনুসারী নয়। আমি ওদের ভাল করে চিনি। শৈশবেও আমি তাদের সঙ্গে কাটিয়েছি, যৌবনেও তাদের সঙ্গে কাটিয়েছি। তারা ছিল দুষ্ট প্রকৃতির বালক ও দুষ্ট প্রকৃতির যুবক। তোমাদের কপাল পুড়ুক! আল্লাহর কসম! এরা কুরআনে কারীম এ কারণে উত্তোলন করেনি যে, শুধু তারাই তা পাঠ করে থাকে আর তাতে কি আছে তোমরা তা জান না। তারা শুধু প্রতারণা, কূটকৌশল ও চক্রান্তের উদ্দেশ্যেই তা উত্তোলন করেছে। শ্রোতারা (ইরাকীরা) বলল, আমাদের মহান আল্লাহর কিতাবের দিকে আহ্বান করা হবে, আর আমরা তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করব তা আমাদের পক্ষে সমীচীন নয়।

হযরত আলী (রা.) তাদেরকে বললেন, আমি তো তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করছি এ উদ্দেশ্যে যাতে তারা মহান আল্লাহর কিতাবের অনুগত্য করে। কেননা তারা তাদের প্রতি মহান আল্লাহর আদেশের অবাধ্য হয়েছে, তাঁর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার বর্জন করেছে এবং তাঁর কিতাবকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। তখন মিস'আর ইবনে ফদাকী তামীমী ও যায়েদ ইবনে হুসাইন তাঈ-সাবাঈ (আম্বাসী) ও তাদের অনুগামী একদল কুরআনবিদ পণ্ডিত-যারা খারিজী মতাবলম্বী হয়েছিল-তারা

বলল, হে আলী! যখন আপনাকে মহান আল্লাহর কিতাবের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তাতে সাড়া দিন। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৪৯৩)

পরবর্তীতে খারিজীরা যখন সংগঠিত হলো, তাদের বিরোদ্ধে আলী (রা.) যুদ্ধ করে উত্তমরূপে সায়েস্তা করেছিলেন। এ যুদ্ধের যৌক্তিকতা সর্ম্পকে শাহ অলী উল্লাহ (র.) ইযালাতুল খাফা কিতাবে লিখেছেন: এখন রইল হারুরাবাসী খারিজীদের ব্যাপার। তারা তো বাতিলের ওপরই ছিল এবং তার নিদর্শন হল তারা কুফর ও ফিসক মিশ্রিত আকীদা রাখত। এ কথার দলীল এই যে, হারুরাবাসীদের ব্যাপারে মুতাওয়াতির হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তারা দ্বীন থেকে সেভাবে বেরিয়ে যাবে, যেভাবে তীর শিকারকে ভেদ করে বেরিয়ে যায়। এ হাদীস বর্ণনা করেছেন সাহল ইবনে হানীফ, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও সাঈদ প্রমূখ"। (ইযালাতুল খাফা, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪২৩-৪২৪)

লওহে মাহফুজের ইলম রাসূলে পাক (সা:)-এর ইলমের একটি অংশ মাত্র

বুখারী শরীফে কিতাবুল ইলম অধ্যায়ে হাতের ইশারায় ফতোয়া প্রদান নামে একটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। উক্ত পরিচ্ছেদে দীর্ঘ হাদীসের একটি অংশ তুলে ধরে তার উপর পর্যালোচনা করা হল। হাদীসটি নিম্নরূপ- قال ما من شي لم اكن اريته الا رايته في مقام هذا حتي الجنة و النار

রাসূল (সা:) ইরশাদ করেন, যা কিছু আগে আমাকে দেখানো হয় নাই সব কিছু আজ এই স্থানেই দেখেছি। এমনকি বেহেশত এবং দোযখও দেখেছি। (বুখারী)

ইবনুল হাজ্জ মালিকির উস্তাদ ইমাম ইবনে আবি জামরা (র.) (মৃত্যু ৬৯৮ হিজরী) বুখারী শরীফের ৩০০ শত নির্বাচিত হাদীসের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'বাহজাতুন নুফুস' কিতাবে উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন-

(حتى الجنة والنار) هذا اللفظ محتمل لوجهين الاول أن يكون عليه السلام أراد أن يخبرهم بأنه عاين كل ما يلقون بعد خروجهم من هذه الدار حتى يستقروا في الجنة والنار الثاني أن يكون عليه السلام أراد أن يخبرهم بعظم ما رأى من أمور الغيب فذكر الجنة والنار تنبيها على ذلك لأن الجنة قد روي أن سقفها عرش الرحمن والنار في أسفل السافلين تحت البحر الأعظم فإذا رأى هذين الطرفين فمن باب أولى يرى ما بينهما

অনুবাদ: বেহেশত এবং দোযখ দেখানো হয়েছে একথার দু'টি ব্যাখ্যা হতে পারে। এক: রাসূলে পাক (সা:) বলতে চাচ্ছেন যে, তিনি ঐ সমস্ত বিষয়গুলো দেখেছেন যা মানুষ দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়ার পর বেহেশত এবং দোযখ পর্যন্ত পৌছার মধ্যখানে অবলোকন করবে।

দুই: রাসূল (সা:) গাইবের বিষয়গুলো দেখার গুরুত্ব সর্ম্পকে অবগত করতে চান। বেহেশত ও দোযখের আলোচনা কেবল দৃষ্টান্ত স্বরূপ করেছেন। কেননা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত বেহেশতের ছাদ আরশের সাথে লাগানো। দোযখ মহা সমুদ্রের নিচে পাতালপুরীর নিম্ন স্তরে রয়েছে। উল্লেখ্য: সৃষ্টি জগতের সর্বোচ্চ স্থানে থাকা বস্তু এবং সর্বনিম্নের বস্তুকে দেখার কথা তিনি বলেছেন। সুতরাং মধ্যখানের সব কিছু দেখার কথা আরো উত্তমরূপেই বুঝা যাচ্ছে। (বাহজাতুন নুফুস)

উপরোউল্লেখিত ব্যাখ্যায় যেসব গাইবের বিষয় রাসূল (সা:) দেখেছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সবকিছু উম্মতের কাছে বর্ণনা না করার কারণ সম্পর্কে ইমাম ইবনে আবি জামরা (র.) লিখেছেন-

الوجه الرابع. فيه دليل على أن ما أرى له عليه السلام من الغيوب فله الاخبار به وله أن لا يخبر وله أن يخبر ببعضه ولا يخبر بالبعض بخلاف الوحي فان عليه أن يخبر به كله لأنه عليه السلام لما أرى له هنا ما أرى أخبر ببعض ما رأى وهي الجنة والنار وسكت عن الغير ولم يكن ليفعل ذلك في الوحي الا أن يخبر به كله كما أوحي اليه والحكمة في ذلك والله أعلم أنه قد يكون فيما يرى أشياء لا يمكن لأحد الاطلاع عليها ولا يقدر على ذلك الا هو عليه السلام لما مده الله به من القوة والعون بخلاف الوحي فأنه لا يكون الا بقدر ما تقدر الأمة على تلقيه

অনুবাদ: ৪র্থ কারণ: এতে রয়েছে একথার দলীল যে, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গাইবের যেসকল বিষয় দেখানো হয়েছে, তা দ্বারা উদ্দেশ্য তাঁকে সংবাদ প্রদান করা। সবকিছু (উম্মতের কাছে) বর্ণনা করা তাঁর দায়িত্ব নয়। তাঁর দায়িত্ব হচ্ছে এর কোনটি বর্ণনা করা, আবার কোনটি বর্ণনা না করা। ওহীর বিষয়টি হচ্ছে এর ব্যতিক্রম। কারণ ওহীর বিষয়সমূহ বর্ণনা করা তাঁর জন্য আবশ্যক ছিল। কারণ রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে যা দেখেছিলেন তার কিছু বর্ণনা করেছেন। যেমন- বেহেশত, দুযখ; আর অন্যান্য বিষয় বর্ণনা করা থেকে নিরব রয়েছেন। ওহীর ব্যাপারে এরূপ করেননি; বরং ওহীর সব কিছুই বর্ণনা করেছেন। (গাইবের ব্যাপারে সব কিছু) বর্ণনা না করার হিকমত আল্লাহই ভাল জানেন। তিনি যা কিছু দেখেছেন তার সব কিছু মানুষ কে অবগত করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া এটা তিনি (রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছাড়া আর কারো অবগত হওয়ার ক্ষমতাও নেই। কারণ আল্লাহ পাক তাঁকে এর শক্তি ও ক্ষমতা প্রদান করেছেন। (যা অন্য কাউকে দেননি।) ওহীর ব্যাপারটি ভিন্ন; কারণ এটা থেকে শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতা উম্মতের রয়েছে। (বাহজাতুন নুফুস)

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হল রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জ্ঞান সাগরে যেসব গাইবের ইলম রয়েছে তার মধ্যে থেকে উম্মতের প্রয়োজনীয় অংশ বর্ণনা করা তাঁর দায়িত্ব ছিল। বাকিটুকু তাঁর জ্ঞান ভান্ডারে সঞ্চিত রয়েছে। তবে ওহীর মারফতে তিনি যা অর্জন করেছেন তাঁর সবকিছু উম্মতের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।

'বাহজাতুন নুফুস' সম্পর্কে শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দীসে দেহলভী (র.) 'বুসতানুল মুহাদ্দিসীন কিতাবে লেখেছেন- এ কিতাব আবু আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ ইবনে আবি জামরা এর রচিত। এতে প্রায় বুখারী শরীফ থেকে ৩০০ টি হাদীস চয়ন করে ২ খণ্ডে এর ব্যাখ্যা করেছেন। এতে অনেক গভীর জ্ঞান এবং অনেক অজানা তথ্য এতে সন্নিবেশিত করেছেন। তিনি তাঁর সময়কার একজন প্রশিদ্ধ ও মহান ওলী ছিলেন। (বুসতানুল মুহাদ্দিসীন, পৃষ্ঠাঃ ২০৬)

ইবনুল হাজ্জ মালিকী তাঁর লিখিত 'আল-মাদখাল' কিতাবের শুরুতে আবু জামরা সম্পর্কে লেখেন- 'আশ-শায়খ, আল-ইমাম, আল-আলিম, আল-আমিল, আল-মুহাক্কিক, আল-কুদওয়াহ' (আল-মুদখালের ভূমিকা)

ইবনে আবি জামরার উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থনে কসীদায়ে বুরদাহ এর কয়েকটি কবিতা -

فَاقَ النَّبِيِّينَ فِيْ خَلْقٍ وَفِيْ خُلُقٍ   وَلَمْ يُدَانُوْهُ فِيْ عِلْمٍ وَلاَ كَرَمِ
وَكُلُّهُمْ مِنْ رَّسُوْلِ اللهِ مُلْتَمِسٌ   غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ اَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ
وَوَاقِفُوْنَ لَدَيْهِ عِنْدَ حَدِّهِمِ   مِنْ نُقْطَةِ الْعِلْمِ اَوْ مِنْ شَكْلَةِ الْحِكَمِ

অনুবাদ : সৃষ্টি ও চরিত্রের দিক থেকে তিনি সকল নবীর চেয়ে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। ইলমের ও সম্মানের দিক থেকে তাঁর নিকটবর্তী কেউ হতে পারেননি। তাঁদের সকলেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ থেকে ফয়েয গ্রহণ করেছেন যেমন সাগর থেকে এক অঞ্জলি পরিমান কিংবা এক চুমুক পরিমান। তাঁরা সকলেই তাঁর সামনে দণ্ডায়মান। তাঁদের জ্ঞানের পরিধি হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জ্ঞানের তুলনায় একটি নুকতা কিংবা হরকতের সমপরিমান।

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দীসে দেহলভী (র.) কর্তৃক স্বীয় পিতা শাহ আব্দুর রহিম দেহলভী (র.)-এর কশফ এর আলোচনা

حضرت ایشان

یک روزے وقت عصر در مراقبہ بودم غیبتے واقع شد و آں وقت را وسیع کردند بمقدار اربعین الف عام و دراں
مدت ہر کسی را کہ از ابتداء خلقت پیدا شدہ بود تا یوم القیمۃ و احوال و افعال ہر یک ظاہر نمودند و ظن کاتب حروف
آنست کہ در ذیل کلمات فرمودند کہ حروف لا الہ الا اللہ را مسافت چندیں ہزار سالہ بود واللہ اعلم۔

অনুবাদঃ আমার পিতা আব্দুর রহিম দেহলভী (র.) বলেন, একদিন আমি আসরের নামাজের পর মুরাকাবায় বসেছিলাম। ইতিমধ্যে অদৃশ্য জগত উন্মোচিত হওয়ার মত অবস্থা হয়ে গেল। এ সময়টুকু আমার জন্য চল্লিশ হাজার বছরের মত দীর্ঘ করে দেয়া হল। এ সময় সৃষ্টির প্রথম থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সৃষ্টিকুলের অবস্থা ও নিদর্শন আমার সামনে প্রকাশিত হলো। আমার (শাহ ওয়ালী উল্লাহ) মনে হচ্ছে তিনি ইহাও বলেছেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর অক্ষর সমূহের দূরত্বও এতটুকু। আল্লাহ বেশী জানেন। (আনফাসুল আরিফিন, পৃষ্ঠাঃ ৩৬)

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দীসে দেহলভী (র.) তার চাচা শায়খ আবু রেজা এর মালফুজাত অধ্যায়ে আনফাসূল আরিফিন কিতাবে লিখেছেন

دیگر می فرمودند در لوح نوشتہ دیدم قال رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم حسنات الابرار سیئات المقربین کاتب حروف گوید یعنے اگرچہ بسیاری از علماء محدثین گفتہ اند این
حدیث نیست قول سلف است

শেখ আবূ রেজা বলেন, আমি লওহে মাহফুজে দেখেছি যে, قال رسول الله صلي الله

عليه وسلم حسنات الابرار سيات المقربين

(আবরার স্তরের বুর্জুগনের নেক কাজও আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের দৃষ্টিতে অপরাধের অর্ন্তভূক্ত) আমার (ওলী উল্লাহ) মতে এ বক্তব্যের অর্থ হলো যদিও অধিকাংশ মুহাদ্দীসগণ উক্ত হাদীসকে সালাফের উক্তি বলেছেন। প্রকৃত পক্ষে ইহা একটি বিশুদ্ধ হাদীস। (আনফাসূল আরিফিন, পৃষ্ঠাঃ ৯৫)

শায়খ আব্দুল কাদির রায়পুরী (র.)-এর লওহে মাহফুজ দেখে দু'আ করা

উলামায়ে দেওবন্দের ফকিহুল উম্মত শায়খ মাওলানা মাহমুদুল হাসান গাঙ্গুহি (দেওবন্দী) মালফুজাতে ফকিহুল উম্মত কিতাবে উল্লেখ করেছেন

ارشاد فرمایا کہ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب

لوح محفوظ میں فیل ہونا لکھا ہے

والے پوری سے کوئی دعا کی درخواست کرتا تو فرماتے کہ ہاں بھئی انشاء اللہ ضرور دعا کروں گا تو وہ کام ہو جاتا اور کبھی یہ فرماتے کہ آپ خود دعا کرو تو وہ کام نہیں ہوتا تھا ایک مرتبہ سہارنپور میں حضرت رائے پوری تشریف لائے تھے ایک صاحب آئے اور اپنے لڑکے کے لئے امتحان میں کامیابی کیلئے دعا کی درخواست کی تو فرمایا کہ آپ ہی اپنے لڑکے کیلئے دعا کریں انھوں نے دوبارہ کہا تو فرمایا کہ جس دلسوزی کے ساتھ آپ اپنے بیٹے کیلئے دعا کرسکتے ہیں کوئی دوسرا نہیں کرسکتا لہذا آپ ہی دعا کریں { ہمارے حضرت نے فرمایا } میں نے اُن صاحب کو منع بھی کیا مگر انھوں نے غور نہ کیا پھر کہا کہ حضرت اگر آپ ہی دعا فرمادیں تو کیا حرج ہے تو حضرت نے اوپر کی طرف سر اٹھایا پھر فرمایا کہ اگر لوح محفوظ ہی میں اس کا فیل ہونا لکھا ہے تو میری دعا اس کے حق میں کیا کام کرے گی - چند روز بعد وہ صاحب ملے تو میں نے اُن سے پوچھا کہ لڑکے کا کیا ہوا تو کہا کہ فیل ہوگیا ۔

অনুবাদ : লওহে মাহফুযে ফেইল হওয়ার কথা লেখা দেখেছি। হযরত আব্দুল কাদীর রায়পুরীর কাছে কেউ দু'আপ্রার্থী হলে তিনি বলতেন হ্যা, ভাই ইনশাআল্লাহ আমি দোয়া করব। তিনি দু'আ করলেই কাজ হয়ে যেত। কখনো কখনো দু'আপ্রার্থীকে বলতেন, আপনি নিজেই দু'আ করুন। তখন আর কোন কাজ হতো না। একবার রায়পুরী (র.) সাহরানপুরে আসলেন। এক ব্যক্তি তার কাছে নিজ সন্তানের পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়ার জন্য দু'আর দরখাস্ত করল। তখন তিনি বললেন, আপনি আপনার সন্তানের জন্য দু'আ করুন। দোয়াপ্রার্থী পুনরায় দরখাস্ত করল। তখন তিনি বললেন, আপনি আপনার সন্তানের জন্য যে

আন্তরিকতার সাথে দু'আ করবেন তা অন্য কেউ পারবে না। সুতরাং আপনি দু'আ করুন। (মাহমুদুল হাসান গাঙ্গুহী বলেন) আমি ঐ ব্যক্তিকে নিষেধ করা সত্ত্বেও সে বলল, আপনি দোয়া করতে অসুবিধা কি। তখন তিনি (রায়পুরী) উপর দিকে মস্তক উত্তোলন করলেন। অত:পর বললেন লওহে মাহফুযে যদি ফেইল শব্দ লেখা থাকে তাহলে আমার দু'আয় তার কি কাজ হবে। কিছুদিন পর ঐ লোকটিকে পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার সন্তানের কি হয়েছে। সে বলল, পরীক্ষায় ফেল করেছে। (২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা:২৭৯)

মাহমুদুল হাসান গাঙ্গুহী সাহেবের বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হল শেখ আব্দুল কাদির রায়পুরী (আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী সাহেবের অন্যতম ছাত্র) লওহে মাহফুজ দেখার পর কারো জন্য দু'আ করেছেন।

ইমাম বুসিরি (র.) কসিদায়ে বুরদায় লিখেছেন-

فإنّ من جودك الدّنيا وضرّتها ... ومن علومك علم اللّوح والقلم

ইমাম বুসিরি (র.)-এর উপরোক্ত কবিতার ব্যাখ্যায় মুল্লা আলী কারী (র.) তাঁর 'যুবদাহ" কিতাবে লিখেছেন-

وكون علمها من علومه صلي الله عليه وسلم لان علومه تتنوع الي الكليات والجزئيات وحقائق ودقائق وعوارف ومعارف تتعلق بالذات والصفات وعلمها انما سطرا من سطور علمه ونهرا من بحور علمه ثم مع هذا هو من بركة وجوده صلي الله عليه وسلم-

অনুবাদ: এ দু'টি বিষয়ের ইলম রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইলমের একটি অংশ। কারণ রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইলম অনেক প্রকার হতে পারে যেমন- কুল্লিয়াত ও জুযয়িয়াত এর ইলম, বস্তুর হকীকতের ইলম, বস্তুর ভিতরকার সুক্ষ্ম ইলম, ইলমে মা'আরিফ যা আল্লাহ পাকের সত্তা ও গুণাবলির সাথে সংশ্লিষ্ট- ইলম, লওহ ও কলমের ইলম। এগুলো রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইলমের অংশসমূহের মধ্য থেকে একটি অংশ এবং তাঁর জ্ঞান সাগরের একটি ঝর্ণাধারা। আর এটা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের বরকতে হয়েছে। (যুবদাহ শরহে বুরদাহ)

কসীদায়ে বুরদাহ সম্পর্কে শায়খ মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী সাহেবের বক্তব্য

۸ وہابیہ خبیثہ صلوٰۃ وسلام و درود بر خیر الانام علیہ السلام اور قرأت دلائل الخیرات و قصیدۂ بردہ و قصیدۂ ہمزیہ وغیرہ اور اسکے پڑھنے اور اس کے استعمال کرنے و ورد بنانے کو سخت قبیح و مکروہ جانتے ہیں اور بعض اشعار کو قصیدۂ بردہ میں شرک وغیرہ کیطرف منسوب کرتے ہیں۔ مثلاً ؂

یا اشرف الخلق مالی من الوذ بہ — سواک عند حلول الحادث العمم

اے افضل مخلوقات میرا کوئی بھی ٹھکانا نہیں — بجز تیرے بروقت نزول حوادث

حالانکہ ہمارے مقدس بزرگان دین اپنے متعلقین کو دلائل الخیرات وغیرہ کی سند دیتے ہیں اور ان کو کثرت درود وسلام و تخیرات و قرأت دلائل وغیرہ کا امر فرماتے ہیں۔ ہزاروں کو مولانا گنگوہی اور مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہما نے اجازت عطا فرمائی اور مدتوں خود بھی پڑھتے رہے ہیں اور مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مثل شعر بردہ فرماتے ہیں ؂

مدد اے کرم احمدی کہ تیرے سوا — نہیں ہے قاسم بیکس کا کوئی حامی کار

جو تو ہی ہم کو نہ پوچھے۔۔ تو کون پوچھیگا — بنے گا کون ہمارا تیرے سوا غمخوار

حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب مرحوم و مغفور دیوبندی نے فہم عوام کے واسطے قصیدۂ بردہ کی اردو میں شرح فرمائی اور اس کو باعث سعادت خیال فرمایا۔ غرضیکہ ہمیشہ یہ حضرات اکابران سب کی قرأت وغیرہ کی اجازت دیتے رہے۔

অনুবাদ: খবীস ওয়াহাবীরা রাসূল (সা.)-এর উপর দুরূদ ও সালাম পাঠ, দালাইলুল খায়রাত, কাসিদায়ে বুরদাহ, কাসিদায়ে হামাযিয়াহ ইত্যাদি পাঠ করাকে জঘন্য এবং নিন্দনীয় কাজ বলে মনে করে। কাসিদায়ে বুরদাহর কোন কোন পংক্তিকে শিরকের সাথে সম্পৃক্ত করে। যেমন (কাসিদায়ে বুরদাহর একটি পংক্তি হলো)

يا اشرف الخلق مالي من الوذبه + سواك عند حلول الحادث العمم

অনুবাদ: হে সর্বোত্তম সৃষ্টি! আপনি ছাড়া আমার আর এমন কেউ নেই; যার কাছে আমি আমার কঠিন বিপদে আশ্রয় প্রার্থনা করব।

অথচ আমাদের বুযুর্গানে কিরাম তাদের অনুসারীদের দালাইলুল খায়রাত ইত্যাদি পাঠ করার সনদ দিয়েছেন এবং তাদেরকে বেশি বেশি দুরূদ পড়ারও নির্দেশ দিয়েছেন। হাজার হাজার মানুষকে গঙ্গুহী সাহেব ও থানবী সাহেব দালাইলুল খায়রাত পড়ার অনুমতি দিয়েছেন এবং দীর্ঘদিন নিজেও পাঠ করেছেন। নানুতুবী সাহেবও কাসিদায়ে বুরদাহর উপরোল্লেখিত পংক্তির অনুরূপ কবিতা রচনা করেছেন।

যেমন- "আহমদী করুনা দিয়ে আমাকে সাহায্য করুন, আপনি ছাড়া অসহায় কাসিমের কোন রক্ষক নেই। আপনি যদি আমাকে গণ্য না করেন তাহলে আর কে আমাকে গণ্য করবে? আপনি ছাড়া কে হবে আমার দুঃখ দূরকারী?"

হযরত যুলফিকার আলী মরহুম ও মগফুর দেওবন্দী সাধারণ মানুষের বোধগম্যের জন্য কাসিদায়ে বুরদাহর উর্দু অনুবাদ করেন এবং এটাকে নিজের সৌভাগ্যের কারণ মনে করতেন। মোটকথা, সব সময় বুযুর্গানে দীন এসবের ইজাযত দিতেন, ওযীফা হিসাবে পাঠ করতেন। (আশ-শিহাবুস সাকিব, পৃষ্ঠা-৮৬-৮৭)

রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইলমের ব্যাপকতা সম্পর্কে মাদানী সাহেবের বক্তব্য

রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইলমের ব্যাপকতাকে অস্বীকার করার অভিযোগের জবাবে শায়খ মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী সাহেব আশ শিহাবুস সাকিব কিতাবে যে বক্তব্য উল্লেখ করেছেন তা নিম্নে পেশ করা হল।

۱۱ وہابیہ سوائے علم احکام الشرائع جملہ علوم اسرار حقانی وغیرہ سے ذات سرور کائنات خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خالی جانتے ہیں اور یہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ علم احکام و شرائع علم ذات و صفات و افعال جناب باری عز اسمہ و اسرار حقانی کونیہ وغیرہ وغیرہ میں حضور سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کا وہ رتبہ ہے کہ وہ کسی مخلوق کو نصیب ہوا اور نہ ہوگا علم اور ما سوا اس کے جتنے کمالات ہیں سب میں بعد خداوند اکرم عز اسمہ مرتبہ حضور علیہ السلام کا ہے علوم اولین و آخرین سے آپ مالامال فرمائے گئے ہیں۔ کوئی بشر کوئی ملک کوئی مخلوق آپکے ہم پلہ علوم اور دیگر کمالات میں نہیں ہو سکتا چہ جائیکہ آپ سے افضل ہو۔ ہاں البتہ احاطہ جملہ جزئیات و کلیات کونیہ کا مخصوص بجناب باری تعالیٰ عز اسمہ ہے، وہی علام الغیوب والشہادات ہے۔ بس دیکھئے کس قدر فرق ان حضرات کے عقائد اور وہابیہ کے عقائد میں ہے

অনুবাদ : ওয়াহাবীরা মনে করে সরওয়ারে কায়েনাত খাতামুন নাবিয়্যিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহকামে শরীয়তের বাইরে আল্লাহ পাকের আসরার এর জ্ঞান রাখেন না। তারা (আকাবিরে দেওবন্দ) বলেন, আহকাম ও শরীয়তের জ্ঞান, আল্লাহর যাত ও সিফাতের জ্ঞান, আল্লাহ আযযা ইসমুহু-এর আসরারে হক্কানীর জ্ঞান ইত্যাদি ইত্যাদি জ্ঞানে রাসূলে পাকের এমন এক মর্তবা রয়েছে যা সৃষ্টির আর কারো ছিল না এবং হবেও না। ইলম ও অন্যান্য যত পূর্ণতা রয়েছে সব ক্ষেত্রে আল্লাহ আযযা ইসমুহু-এর পর সর্বাধিক মর্তবাপূর্ণ হচ্ছেন হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। পূর্বাপর সকল ইলম দ্বারা তাকে আল্লাহ মালামাল করেছেন। কোন মানুষ, কোন ফেরেশতা, কোন সৃষ্টি তাঁর সমান ইলম ও অন্যান্য পূর্ণতা লাভ করেন নি, তাঁর চেয়ে উত্তম হওয়াতো দূরের কথা। তবে হ্যাঁ, জুযয়িয়্যাত ও কুল্লিয়াতের সামগ্রিক জ্ঞান আল্লাহ তা'আলা আযযা ইসমুহু-এর জন্য খাস। তিনিই হচ্ছেন অদৃশ্য ও দৃশ্যমান সকল জ্ঞানের ব্যাপারে সর্বজ্ঞ। (আল্লামুল গুয়ুব ওয়াশশাহাদাহ)। সুতরাং দেখুন ঐ সকল বুযুর্গ ও ওয়াহাবীদের আকীদার মধ্যে কতটুকু পার্থক্য। (আশ শিহাবুস সাকিব, পৃষ্ঠা: ৮৮)

তাবিঈদের যুগের মারওয়ান, ইয়াযিদ, যিয়াদ, হাজ্জাজ প্রমূখ ব্যাক্তিবর্গকে কি তাবিঈ বলা যাবে?

পবিত্র কালামে পাকে আল্লাহ তা'আলা তাবিঈদের যে আলোচনা করেছেন তা থেকে বুঝা যায়, তাবিঈ হওয়ার জন্য একটি অতিরিক্ত শর্ত রয়েছে, যা সাহাবীদের ক্ষেত্রে নেই। মারওয়ান, ইয়াযিদ, যিয়াদ, হাজ্জাজ প্রমূখ ব্যাক্তিবর্গের মধ্যে যেহেতু এ শর্ত নেই এ কারণে তারা তাবিঈ হতে পারে না। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন- وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ
অনুবাদ: মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের অনুসরণ করেছেন। (আত-তাওবাহ, আয়াত: ১০০)
এ আয়াতের তাফসীরে ইমাম আলুসি বাগদাদী তাঁর তাফসীরে রুহুল মা'আনীতে একটি উদ্ধৃতি পেশ করেছেন-

روي عن حميد بن زياد أنه قال : قلت يوما لمحمد بن كعب القرظي ألا تخبرني عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما كان بينهم من الفتن فقال لي : إن الله تعالى قد غفر لجميعهم وأوجب لهم الجنة في كتابه محسنهم ومسيئهم فقلت له : في أي موضع أوجب لهم الجنة فقال : سبحان الله ألا تقرأ قوله تعالى : والسابقون الأولون الآية

فتعلم أنه تعالى أوجب لجميع أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم الجنة والرضوان وشرط على التابعين شرطا قلت : وما ذلك الشرط قال : شرط عليهم أن يتبعوهم بإحسان وهو أن يقتدوا بهم في أعمالهم الحسنة ولا يقتدوا بهم في غير ذلك أو يقال : هو أن يتبعوهم بإحسان في القول وأن لا يقولوا فيهم سوءا وأن لا يوجهوا الطعن فيما أقدموا عليه

অনুবাদ: হুমাইদ ইবনে যিয়াদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদিন মুহাম্মদ ইবনে কা'ব আল-কুরাযিকে জিজ্ঞেস করলাম, সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যে সকল দন্দ্ব সংঘাত হয়েছিল এসম্পর্কে আপনি কি কিছু বলবেন? তিনি আমাকে বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কালামে তাঁদের সকলকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, এবং তাদের থেকে ভালো কাজ বা এর বিপরীত যাই সংঘটিত হোক না কেন, তাদের জন্য বেহেশত ওয়াজিব করে দিয়েছেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম কুর'আনের কোন জায়গায় আল্লাহ তাদের জন্য বেহেশত ওয়াজিব হওয়ার ঘোষনা দিয়েছেন? মুহাম্মাদ ইবনে কাব আল-কুরাযি বলেন, সুবহানাল্লাহ, তুমি কি কুরআনের আয়াত وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ পড়নি? যদি পড়তে তবে জানতে পারতে আল্লাহ পাক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সকল সাহাবীর জন্য বেহেশত ওয়াজিব করেছেন এবং তিনি তাঁদের উপর সন্তুষ্ট। আর তাবিঈদের ব্যাপারে শর্তারোপ করেছেন। আমি বললাম শর্তটা কী? তিনি বলেন শর্ত হলো ইহসানসহ সাহাবীদের অনুসরণ করা। আর ইহসান হলো তাদের ভালো কাজের অনুসরণ করা এবং এর বিপরিত কাজের অনুসরণ না করা, অথবা ইহসানের অর্থ এটাও হতে পারে তাঁদের প্রতি সুধারনা রেখে তাঁদের অনুসরণ করা, তাদের প্রতি কটুক্তি না করা এবং তাঁদের কৃতকর্মের কারণে তাঁদেরকে দোষারোপ না করা। (তাফসীরে রুহুল মা'আনি)
উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরে কাযী সানাউল্লাহ পানিপথি (রহ.)ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।
উক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রমানিত হয় সাহাবী হওয়ার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঈমানের সাথে দেখাই যথেষ্ট, কিন্তু তাবিঈ হওয়ার জন্য একটি অতিরিক্ত শর্ত রয়েছে, আর তা হলো সাহাবীদের সকল ভালো কাজের অনুসরণ করা আবশ্যক। সাহাবীদের সম্পর্কে কোন মন্দ ধারনা না রাখা এবং তাদের সমালোচনা না করা। মারওয়ান, ইয়াযিদ, যিয়াদ, হাজ্জাজ প্রমূখ ব্যাক্তিবর্গ যদিও তাবীঈনদের যুগের ছিলো কিন্তু তাবীঈ হওয়ার জন্য যে সকল শর্ত আবশ্যক তাদের মধ্যে এ সকল গুণের বিপরীত পাওয়া যায়। এজন্য ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মতো মুজতাহিদ ইমামও ইয়াযিদকে কাফির ফতওয়া প্রদান করেন।

মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র.) কর্তৃক লওহে মাহফুয দেখে দু'আ করা

পবিত্র কালামের সূরা 'রা'দ' এর يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ আয়াতের তাফসীরে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) দীর্ঘ আলোচনা করার পর একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তা নিম্নে বর্ণনা করা হল।

আমি (সানাউল্লাহ পানিপথী) বলি হযরত উমর (রা.) ও হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুকূলে একটি ঘটনা উল্লেখিত রয়েছে 'মাকামাতে মুজাদ্দিদিয়া' গ্রন্থে। তাহির লাহোরী নামে এক ব্যক্তি মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র.) এর দু'ছেলে মুহাম্মদ সাঈদ ও মুহাম্মদ মা'সুম এর উস্তাদ ছিলেন। মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র.) কাশফের মাধ্যমে অবগত হলেন যে, মুল্লা তাহির সাহেবের কপালে 'দুর্ভাগা' লেখা রয়েছে। তিনি বিষয়টি তাঁর দু'ছেলের কাছে বললেন। তাঁর দু'ছেলে যেহেতু তাহির সাহেবের ছাত্র ছিলেন এজন্য তাঁরা মুজাদ্দিদ (র.)কে বললেন তিনি যেন তাঁদের উস্তাদের জন্য দু'আ করেন, যাতে আল্লাহ তাঁর কপাল থেকে 'দুর্ভাগা' মিটিয়ে তাতে 'ভাগ্যবান' লিখে দেন। মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র.) বললেন, আমি লওহে মাহফুযে লেখা দেখছি যে, এটা মুবরাম যা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। ছেলেরা বার বার দু'আর জন্য অনুরোধ করতে থাকেন। তখন মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র.) বললেন, আমার স্মরণ হচ্ছে যে, গাওসুস সাকালাইন মুহিউদ্দীন আব্দুল কাদির জিলানী (র.) বলেছেন- 'আমার দু'আর মাধ্যমে অপরিবর্তনীয় তাকদীরও পরিবর্তন করে দেয়া হয়।' এজন্য আমি দু'আ করব। তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে আরয করলেন, হে আল্লাহ! আপনার রহমত অসীম, আপনার অনুগ্রহ একজনের দু'আ কবুলের মাধ্যমে শেষ হয়ে যায় না। আপনার কাছে আশা করি এবং আপনার বিশাল অনুগ্রহের কাছে নিবেদন করি আপনি আমার দু'আ কবুল করুন। মুল্লা তাহিরের কপাল থেকে 'দুর্ভাগা' লেখা মিটিয়ে তদস্থলে 'ভাগ্যবান' লিখে দিন, যেমনিভাবে আপনি গাওসে আ'যম (র.) এর দু'আ কবুল করতেন। মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র.) বললেন, এ দু'আর পর আমার দৃষ্টিতে এলো যে, মুল্লা তাহির'র কপাল থেকে 'দুর্ভাগা' লেখা মিটিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তদস্থলে 'ভাগ্যবান' লিখে দেয়া হয়েছে। আর আল্লাহর জন্য এমন কাজ অসম্ভব নয়। (তাফসীরে মাযহারী)

আল্লাহ পাক তাঁর কোন কোন নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাহকে এক ধরনের ইলম দান করেন যার মাধ্যমে তারা অনেক গাইবের জ্ঞান লাভ করে থাকেন। এ ধরনের জ্ঞান লাভের কারণে বান্দাহর সামনে অনেক অদৃশ্য বিষয় উন্মোচিত হয়ে যায়। যেমন খিযির (আ.)কে আল্লাহ এরকম জ্ঞান দান করেছিলেন। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন- وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا (আমি তাকে আমার পক্ষ থেকে এক ধরনের ইলম দান করেছি) এ আয়াতের তাফসীরে বিখ্যাত মুফাসসির আল্লামা বায়যাবী (র.) তাফসীরে বায়যাবীতে লিখেন-

{وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا} مما يختص بنا ولا يعلم إلا بتوفيقنا وهو علم الغيوب.

অর্থাৎ এটি এমন এক ধরনের ইলম যা আমার জন্য খাস। আমার তাওফীক ছাড়া এ ধরনের জ্ঞান অর্জন করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আর এটা হচ্ছে ইলমে গাইব বা গাইবের জ্ঞান। (তাফসীরে বায়যাবী)

উপরোক্ত তফসীরে খিযির (আ.)-এর ইলমকে ইলমে গাইব বলা হয়েছে।

কামিল ওলীদেরকে আল্লাহ পাক এ ধরনের জ্ঞান প্রদান করেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযি (র.) 'তাফসীরে কবীর'-এ লেখেন-

وكذلك العبد إذا واظب على الطاعات بلغ إلى المقام الذي يقول الله كنت له سمعا وبصرا فإذا صار نور جلال الله سمعا له سمع القريب والبعيد وإذا صار ذلك النور بصرا له رأى القريب والبعيد وإذا صار ذلك النور يدا له قدر على التصرف في الصعب والسهل والبعيد والقريب .

যখন বান্দাহ আল্লাহর আনুগত্যে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন এমন এক স্তরে পৌঁছে যায় যার সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন -আমি তার কান ও চোখ হয়ে যাই। যখন আল্লাহর জালালের নূর তাঁর শ্রবণ শক্তি হয়ে যায় তখন সে নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সব কিছু শুনতে পায়। আর যখন সে নূর তাঁর দৃষ্টি শক্তি হয়ে যায় তখন সে নিকটবর্তী ও দূরবর্তী অনেক কিছু দেখতে পায়। আর যখন সে নূর তাঁর হাত হয়ে যায় তখন সে অনেক কঠিন, সহজ, দূরবর্তী ও নিকটবর্তী কাজের উপর সক্ষমতা লাভ করে। (তফসীরে কবীর খণ্ড: ৫, পৃষ্টা: ৬৮৮)

ওলী আউলিয়াদের এ ধরনের জ্ঞানকে অস্বীকার করার জন্য মু'তাযিলাগণ কুরআনে পাকের একটি আয়াতকে অপব্যাখ্যা করে থাকে। তা হল- عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ

অনুবাদ: আল্লাহ পাক অদৃশ্য জগতের জ্ঞানের অধিকারী। তিনি এ জ্ঞানকে কারো কাছে প্রকাশিত করেন না, কেবল তাঁর নির্বাচিত রাসূলগণ ব্যতিরেকে। (সূরা জিন)

মু'তাযিলাগণ বলেন- وفي هذا ابطال الكرامات لان الذين تضاف اليهم وان كانوا اولياء مرتضين فليسوا برسل

অনুবাদ : উক্ত আয়াত দ্বারা ওলীগণের কিরামত বাতিল সাব্যস্ত হয়ে যায়। কারণ তারা আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা হলেও রাসূল নন।

মু'তাযিলাদের এমন উক্তির জবাবে শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) 'তাফসীরে আযিযি'তে দীর্ঘ আলোচনার পর লেখেন- অনেক ওলীআল্লাহ কর্তৃক লওহে মাহফুজের লিপিবদ্ধ বিষয়সমূহ দেখার পাশাপাশি তা অধ্যায়ন করা, লাওহে মাহফুজ সম্পর্কে অবগতি লাভ করা মুতাওয়াতির বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত আছে। (দেখুন তাফসীরে ফতহুল আযিয, সূরা জিন-এর তাফসীর)

আল্লাহ পাকের গাইবের ইলম হচ্ছে স্বত্তাগত: পক্ষান্তরে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গাইবের ইলম হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ব। এ ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। আল্লাহর ইলমের মুকাবিলায় তা সীমিত: তবে তা সৃষ্টি জগতের বোধগম্যের বাইরে। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইলমে গাইব জানেন বললে তা দ্বারা আল্লাহ প্রদত্ব ইলমে গাইবই বুঝানো হয়। এ আকীদার উপর ভিত্তি করে আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত-তাবারী (র.) (ইন্তিকাল: ২১০ হিজরি) এর বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ 'তাফসীরে তাবারী' কিতাবে হযরত খিযির (আ.) গাইব জানতেন বলে আলাচনা উপস্থাপন করেছেন। উক্ত কিতাব থেকে কিছু আলোচনা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

(قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا)، وكان رجلا يعلم علم الغيب قد علم ذلك، فقال موسى: بلى قال: (كَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا): أي إنما تعرف ظاهر ما ترى من العدل، ولم تُحط من علم الغيب بما أعلم،

তিনি ছিলেন এমন এক ব্যক্তি যিনি গাইব জানতেন। তাঁকে তা জানানো হয়েছিল। মূসা (আ.) বললেন, হ্যাঁ, আমি ধৈর্য্য ধারন করতে পারব। তিনি বললেন, (কিভাবে আপনি ধৈর্য্য ধরবেন এমন ব্যাপারে যার সম্পর্কে আপনার জ্ঞান নেই।) অর্থাৎ- আপনি বাহ্যিক ন্যায় বিচার যা দেখেন তা জানেন। কিন্তু আমি যে গাইব সম্পর্কে অবগত তা আপনি জানেন না। (তাফসীরে তাবারী)

উল্লেখ্য, উপরোক্ত তাফসীরে বলা হয়েছে যে, হযরত খিযির (আ.) গাইব জানতেন। তাছাড়া এও বলা হয়েছে যে, খিযির (আ.) যে গাইব জানতেন তা মূসা (আ.)-এর পক্ষেও জানা সম্ভব ছিল না। ওহাবীগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সকল ইলমে গাইব জেনে ফেলেছে বলে দাবী করে তা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত।

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে রক্ষিত জ্ঞান সমুদ্র হতে তিনি তাঁর উম্মতের যোগ্যতা অনুসারে কোন শীর্ষস্থানীয় ওলীআল্লাহকে সময় সময় কিছু দান করেন। এ প্রসঙ্গে আমরা শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)-এর 'ফুয়ুযুল হারামাইন' কিতাব থেকে কিছু আলোচনা তুলে ধরছি।

لما كان اليوم الثالث سلمت عليه صلي الله عليه وسلم وعلي صاحبيه رضي الله عنهما ثم قلت يا رسول اللهٖ افض علينا مما افاض الله تعالي عليك جئناك راغبين في خيرك وانت رحمة للعالمين فانبسط الي انبساطاعظيما حتي تخيلت كأن عطافة ردائه لفتني وغشيتي ثم غطني غطة وتبدي لي واظهر لي الاسرار وعرفني بنفسه وامدني امدادا عظيما اجماليا وعرفني كيف استمد به في حوائجي وكيف يرد هو الي من يصلي عليه وكيف ينبسط الي من اطري في مدحه والح عليه –

(শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) বলেন) তৃতীয় দিনে আমি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর দুই সাহাবী (হযরত আবুবকর (রা.) ও উমর (রা.)কে সালাম দিলাম। অত:পর বললাম ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আল্লাহ আপনাকে যে ইলম দান করেছেন তা থেকে আমাকে দান করুন। আমি আপনার

কাছে আশা নিয়ে এসেছি। আপনি তো রাহমাতুল লিল আলামীন। তিনি আমার দিকে পূর্ণরূপে খেয়াল করলেন। তাঁর দয়ার চাদরে আমাকে বেষ্টন করে নিলেন। আমাকে ঢেকে দিলেন। আমার কাছে ইলমে মা'রিফতের ভেদসমূহ প্রকাশ করলেন। এবং তিনি নিজেই ঐ বিষয়সমূহ সম্পর্কে অবগত করলেন এবং আমাকে অনেক বড় সাহায্য করলেন। (ফুয়ুযুল হারামাইন, মাশহাদ নং ১০)

কোন কোন সময় ওলী আল্লাহগণও মুযাহাদা'র মাধ্যমে লাওহে মাহফুজের ইলম অর্জন করতে পারেন

মুল্লা আলী কারী (র.) মিরকাত কিতাবে হাদীসে জিবরীলের ব্যাখ্যায় শায়খ কবীর আবু আব্দুল্লাহ'র একটি উক্তির ব্যাখ্যায় যা লিখেছেন তা থেকে প্রমানিত হয় আল্লাহর ওলীগণও এক প্রকার গাইব জেনে নিতে পারেন, যাকে বলা হয় 'গাইবে এযাফী'। নিম্নে শায়খ কবীর-এর উক্তি ও মুল্লা আলী কারী (র.)-এর ব্যাখ্যা তুল ধরা হল।

قال الشيخ الكبير أبو عبدالله في معتقده ونعتقد أن العبد ينقل في الأحوال حتى يصير إلى نعت الروحانية فيعلم الغيب وتطوى له الأرض ويمشي على الماء ويغيب عن الأبصار

অনুবাদ : শায়খ আল কবীর আবু আব্দুল্লাহ 'মু'তাকাদ' কিতাবে বলেছেন, আমি বিশ্বাস করি বান্দাহ বিভিন্ন অবস্থায় রূপান্তরিত হয়ে অবশেষে রূহানীগুণাবলিতে গুনান্বিত হয়। তখন সে গাইব সম্পর্কে অবগত হতে পারে। জমিন তার জন্য সংকুচিত করে দেয়া হয়, সে পানির উপরে হাটতে পারে এবং দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। (মিরকাত)

উপরোক্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যায় মুল্লা আলী কারী (র.) লিখেন-

وذلك إذا تنور الروح القدسية وازداد نوريتها وإشراقها بالإعراض عن ظلمة عالم الحس وتحلية مرآة القلب عن صدأ الطبيعة والمواظبة على العلم والعمل وفيضان الأنوار الإلهية حتى يقوى النور وينبسط في فضاء قلبه فتنعكس فيه النقوش المرتسمة في اللوح المحفوظ ويطلع على المغيبات

অনুবাদ: আর যখন পবিত্র রূহসমূহ আলোকিত হয় এবং এর নুরিয়াত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এর স্বাভাবিক জগতের প্রাসঙ্গিক অন্ধকার হতে আলোতে উদ্ভাসিত হয় এবং জাগতিক অবস্থা থেকে অন্তরের আয়না যখন সজ্জিত হয়, ইলম ও আমলের উপর যখন সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকে, আর নূরে এলাহি দ্বারা ফয়েযপ্রাপ্ত হয়, ফলে এ নূর আরো শক্তিশালি হয়, এবং অন্তর্দৃষ্টি বিস্তার লাভ করে। তখন লওহে মাহফুযের গ্রথিত নকশা প্রতিবিম্বত হয় এবং গাইবের বিষয়সমূহের অবগতি লাভ করেন। (মিরকাত: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১২৩)

রাসূল (সা.) এর সম্মানে হাজার বছর পূর্বে মদীনাবাসী থেকে প্রতিশোধ না নেয়ার দৃষ্টান্ত

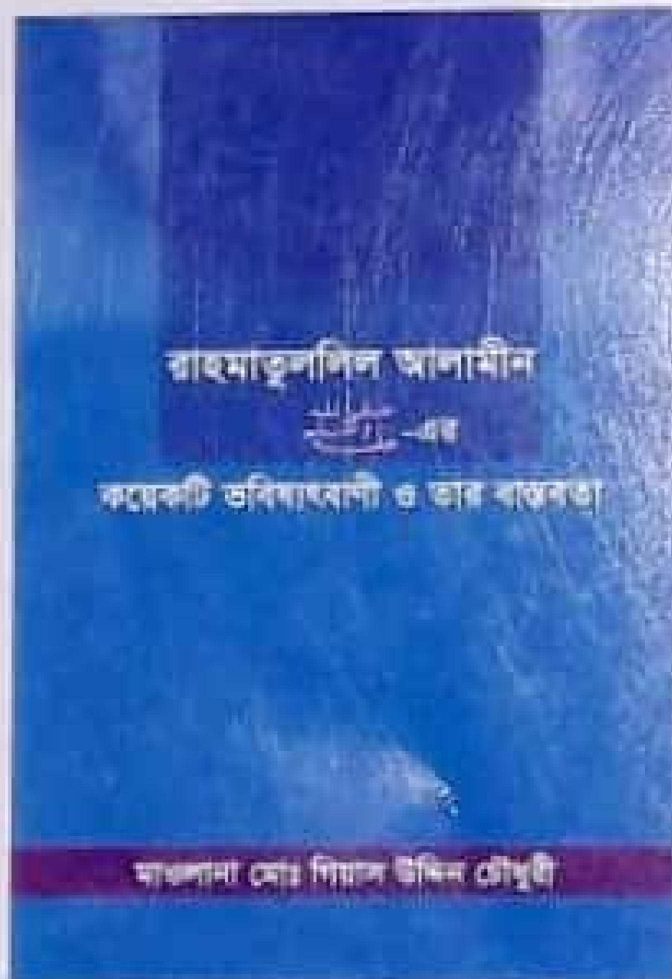
আল্লামা ইবনে কাসীরের বর্ণনা অনুযায়ী তুব্বা সম্রাট রাসূলে পাক (সা.)-এর প্রায় ৭০০ বছর পূর্বে ইন্তেকাল করেন। তার রাজত্বকাল ছিল ৩২৬ বছর। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

তুব্বা সম্রাট পূর্বদেশীয় রাজ্যগুলো জয় করে মদীনা হয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করছিলেন। অভিযানের শুরুতেও তিনি মদীনা হয়ে গিয়েছিলেন। মদীনার অধীবাসীদেরকে তিনি উচ্ছেদ করেননি। তার এক পুত্রকে তিনি তাদের শাসকরূপে রেখে গিয়েছিলেন। গুপ্তঘাতকের হাতে তার ওই পুত্র সেখানে নিহত হন। (বিদায়া ওয়ান নিহায়া) একারণে তিনি মদীনা আক্রমন করতে উদ্যত হন। তার পর দুই জন ইহুদী ধর্ম যাজক তাকে আক্রমন না করার জন্য উপদেশ দিলেন। এ প্রসঙ্গে তাফসীরে ইবনে কাসীরে লিখেছেন, হযরত সাদ ইবনে যুবায়ের (রা.) বলেন, তুব্বা কাবা শরীফে প্রথম গিলাফ পরিয়েছিলেন। রাসূলে পাক (সা.) তুব্বাকে গালি দিতে নিষেধ করেছেন। (নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণিত, তোমরা তুব্বাকে গালি দিও না। কারন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন)। উক্ত তুব্বা ছিলেন মধ্যবর্তী সময়ের তুব্বা সম্রাট। তার নাম ছিল- আসাদ আবু কুরাব ইবনে মুলায়কা ইয়ামনী। তার রাজত্বকাল ৩২৬ বছর পর্যন্ত ছিল। তুব্বা বাদশাদের মধ্যে কেউই এত লম্বা রাজত্ব পরিচালনার সুযোগ পাননি। রাসূলে পাক (সা.)-এর আগমনের প্রায় ৭০০ বছর পূর্বে তার ইন্তেকাল হয়েছে। ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেছেন, উক্ত দুইজন ধর্ম যাজক মদীনার অধিবাসী ছিলেন। তারা দুইজন যখন তুব্বা বাদশাহকে বুঝাতে সক্ষম হলেন, যে এই শহরটি আখেরী নবী হযরত আহমদ (সা.)-এর হিজরতের স্থান। তখন বাদশাহ একটি কবিতা রচনা করেছিলেন এবং সে কবিতাটি মদীনাবাসীর কাছে আমানত রেখেছিলেন যা বংশানুক্রমে পরবর্তীদের কাছে পৌছে। রাসূলে পাক (সা.) যখন হিজরত করে মদীনায় আসলেন তখন এই কবিতাটি ছিল আবু আইয়ূব আনসারী (রা.)-এর কাছে। ঘটনা ক্রমে রাসূলে পাক (সা.) তাঁর ঘরেই উঠলেন। কবিতাটি নিম্নরূপ:

شهدت على احمد انه * رسول من الله بارى النسم
فلومد عمرى الى عمره * لكنت وزيرا له وابن عم
وجاهدت بالسيف عداه * وفرجت عن صدره كل غم

(তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা- দুখান)

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী (র.) তাফসীরে দুররে মানসুরে লেখেন, তুব্বা সম্রাট মদীনাবাসীকে যে নসীহত করেছিলেন তা নিম্নরূপ : তুব্বা আউস ও খাযরাজ গোত্রের লোকদেরকে বললেন, তোমরা মদীনায় বসবাস করো। তিনি (মুহাম্মদ সা.) তোমাদের কাছে আসলে তাকে আশ্রয় দিবে এবং তাঁর উপর ঈমান আনবে। আর যদি তোমাদের জীবদ্দশায় তিনি না আসেন তবে তোমাদের সন্তানদেরকে অসীয়ত করে যাবে। (দুররে মানসূর, খণ্ড:৭, পৃষ্টা: ৪১৭)


রাহমাতুললিল আলামীন
-এর
কয়েকটি ভবিষ্যৎবাণী ও তার বাস্তবতা
মাওলানা মোঃ গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী